তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও শ্রেণীবিন্যাস

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সমৃদ্ধ নাট্যচর্চার সুবাদে বৃহত্তর বঙ্গে অন্যতম প্রধান স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। জেলার নাট্যচর্চার ধারায় মূলত: ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 'বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিশেন' নামে শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক সংস্থার উদ্যোগে অবিভক্ত দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমা শহরে সংস্কৃতি চর্চা বিশেষ রকরে নাট্যচর্চা শুরু হয় এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ থানা শহরে গিরি-গোঁসাই পরিবারের বন্দরস্থ বাসভবনে জমিদার-যতীন্দ্রমোহন গোস্বামীর স্বীয় উদ্যোগে নাট্যচর্চার উন্মেষ হয়। সেই সঙ্গে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এ জেলার স্বনামধন্য ও খ্যাতনামা নাট্যকার মন্মথ রায়ের হাত ধরে মৌলিক নাট্যরচনার সূত্রপাত হয়। মোটকথা বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই শুরু হয়ে উক্ত নাট্যচর্চার সুবাদে নাট্য সৃজনপর্ব অদ্যাবধি চলমান তবে আমার গবেষণার আলোচ্য বিষয়ের সময়সীমা ১৯০৯-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাই এই সময়সীমার মধ্যে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাদ্বয়ে ক্রমবর্ধমান নাট্যচর্চার সূত্রে রচিত ও সংগৃহীত নাটকগুলির মধ্যে প্রকাশিত এবং মঞ্চায়িত পাণ্ডুলিপি-নাটকগুলির ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, বিশ শতকের প্রথম থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত দিনাজপুরের (উত্তর ও দক্ষিণ) জেলাদ্বয়ে জুড়ে প্রসেনিয়াম থিয়েটার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে যত পরিমাণ নাটক বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে, তার চেয়ে মৌলিক নাটক প্রত্যাশিত সংখ্যায় রচিত না হলেও তুলনামূলকভাবে বেশ কিছু মৌলিক নাটক রচিত হয়েছে। এছাড়া এতদ্‌ঞ্চলের এইসব রচিত নাটকগুলি প্রকাশ প্রবণতার ক্ষেত্রে তেমন কোন তাগিদ লক্ষ করা যায়নি। অর্থাৎ প্রকাশের বাস্তবায়ন কম হয়েছে। আবার স্বভাবতই দেখা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ — এই দুই দিনাজপুরের প্রায় একশ বছরের মঞ্চাভিনয়ের সু-ব্যবস্থা না থাকলেও কলকাতার পেশাদারী সংস্থার মঞ্চ সফল নাটক, সফল গণনাট্য এবং তৎপরবর্তী গ্রুপ থিয়েটার অভিনীত বহু প্রচারিত নাটকগুলির অভিনয়ের প্রভাব বেশ সক্রিয় ছিল। এমনটি এই জেলাদ্বয়ের অধিবাসী বৃন্দের মধ্যে রাজধানী কলকাতা থেকে আমদানী করা নাটকের অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক তথা প্রাধান্য থাকলেও প্রাসঙ্গিকভাবে পরিলক্ষিত হয় এই দুই জেলার সদর শহর ও মফস্বল নির্ভর থানা শহরগুলিতে নাট্যচর্চার মাধ্যমে স্থানীয় নাট্যকারদের রচিত, প্রকাশিত এবং পাণ্ডুলিপি নাটকের মঞ্চাভিনয় হয়েছে। এই সব মৌলিক নাটকের মধ্যে কোন কোন কোন নাটক যেমন মঞ্চসাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি নাটক পূর্ণাঙ্গ বা একাঙ্ক

নাট্য-প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গে, আসামে, কলকাতায়, পাটনা, লক্ষ্ণৌ এবং মুম্বাইতে মঞ্চ-সাফল্যের সঙ্গে সু-উচ্চ প্রশংসা লাভ করে এবং নাট্যমঞ্চায়নে নতুন মাত্রা সংযোজন করে স্বর্ণশিখরে পদার্পণ করেছে। আবার কখনো প্রকাশিত মৌলিক নাটকের পাশাপাশি রূপান্তরিত এবং অনুবাদিত নাটকও মঞ্চ সাফল্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে জেলার নাট্যচর্চাকে সমগ্র বাংলার বুকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। তাই এই আলোচ্য অধ্যায়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে রচিত মৌলিক নাটক, রূপান্তরিত এবং অনুবাদিত নাটকগুলির মধ্যে প্রকাশিত, অপ্রকাশিত এবং মঞ্চ সফল যে সব পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে, সেই সব নাটকগুলির মূল বিষয়বস্তু আলোচনার মধ্য দিয়ে শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারণের সচেষ্ট প্রয়াস করছি।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রচিত নাটকগুলির বিষয়বস্তুগত (ভাবস্তর) বর্ণনা ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস:

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার জেলা সদর রায়গঞ্জের স্বনামধন্য ও খ্যাতনামা নাট্যকার ডা: বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী 'এক ডোরে বাঁধা', 'আকাশ ভরা তারা', 'কাটা মণ্ডুরা কথা কয় ও একাঙ্কগুচ্ছ'— এই তিনটির মধ্যে একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক, প্রথমটি ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একটি নাট্যসংকলন গ্রন্থের রচনাকার। 'এক ডোরে বাঁধা' নাটকটির প্রকাশক হৃষীকেশ বারিক এবং প্রকাশনার কাল-আষাঢ় ১৩৭১ (১৯৬৪ খ্রি:)। 'আকাশ ভরা তারা' নাটকটির প্রকাশক মনীষা প্রকাশনী, রায়গঞ্জ, পশ্চিমদিনাজপুর, নাটকটির প্রকাশকাল— ১৬ জুলাই, ১৯৬৯ খ্রি:। কাটা মন্ডুরা কথা কয়', 'জলের তলায় আগুন', 'সোনার সাহারা' ও 'জাল নোট' এই ৪টি একাঙ্ক নাটক নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আর্থিক সহায়তায় ডা: বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর একটি নাট্যসংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই নাট্যসংকলন গ্রন্থটির প্রকাশক মোম, ৪/২-বি বিজয়গড়, কলকাতা-৩২, প্রকাশকাল-২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ খ্রি:।

এই নাট্যকারের অন্যান্য নাটক। যেমন—

১. 'অগ্নিকন্যা' (সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)।
২. 'জীবন থেকে নেওয়া' (সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)।
৩. 'এরা মানুষ খায়' (সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)।
৪. 'বাসব ও দানব' (সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)।
৫. 'মার্শাল পিকু' (সামাজিক একাঙ্ক নাটক)।
৬. 'রক্তবীজ' (সামাজিক একাঙ্ক নাটক)।
৭. 'সোনার হরিণ' (সামাজিক একাঙ্ক নাট)।

৭. ‘কবি দাদুর পুতুলগুলি’ (সামাজিক একাঙ্ক নাটক)।

৮. ‘ঘাটের কথা’ (শ্রুতিনাটক)।

আলোচ্য পরিসরে ‘একডোরে বাঁধা’ ও ‘আকাশ ভরা তারা’ এই দুটি নাটক এবং ‘কাটা মণ্ডুরা কথা কয় ও একাঙ্ক গুচ্ছ’ এই নাট্যসঙ্কলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একাঙ্ক নাটকগুলি নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হওয়ার প্রয়াস করেছি। একারণে যে উক্ত নাটক দুটি ও নাট্যসংকলন গ্রন্থটি নাট্যকার ডা: বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর সমগ্র নাট্যরচনার প্রতিনিধি স্থানীয় নাট্যসম্ভার এবং উক্ত নাটকগুলি উত্তরবঙ্গসহ বাংলা তথা ভারতব্যাপী খ্যাতি ও সুউচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

‘এক ডোরে বাঁধা’ নাটকে শাশ্বত ও সার্বজনীন মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ বিষয়টি সামাজিক পরিবেশের পটভূমিকায় উপস্থাপিত হয়ে নাট্যক্রিয়া সুসংগঠিত হয়েছে বলে এই নাটকটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই নাটকটি ৯টি দৃশ্যে সমন্বিত হয়ে একটি সুসংহত নাট্য-অবয়ব গড়ে উঠেছে। নাটকটির পুরুষ চরিত্র সংখ্যা ১৪টি এবং স্ত্রী চরিত্র সংখ্যা ২। প্রধান চরিত্র শঙ্করণ, সহপ্রধানচরিত্র কেতন, প্রধান প্রতি পার্শ্বচরিত্র বিলাওল, সহকারী চরিত্র, কিষেণ চাঁদ, রামভগত, মুস্তাফা, ফাল্গুনী, নরেশ্বর, বুড়া, সলিমুল্লা, যন্মুখ্‌ম, সুলতান এবং অপ্রধান চরিত্র মৌলভী, ২ জন গুণ্ডা প্রভৃতি চরিত্র সুন্দরভাবে আলোচ্য নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে।

আলোচ্য নাটকটির উপজীব্য বিষয় হল ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন এবং তাদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (Unity in Diversity) এবং সবরকম সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির (Communal Hermony) এক ভাবগত সংহতির পরিপূর্ণ ও উদ্বুদ্ধ। ভারতের এই সনাতন ও শাশ্বত আবেগময় ভাবটির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই নাটকে পরিস্ফুটিত হয়েছে। বাণী ভারতী শিল্প সংস্থা নাটকটির সমগ্র বৃত্তায়নের পরিমণ্ডলে একটি কেন্দ্রীয় ভাবমূর্তি রূপে প্রকটিত হয়ে উঠেছে যা নাটকের ৯টি দৃশ্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকে একটি স্থায়ী বন্ধনের সূচনা করেছিল। এর ফলে লক্ষ করা যায় নাটকের দৃশ্যগুলি কেন্দ্রীয় ভাবের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থেকে এবং প্রাসঙ্গিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে— নাট্যরস সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

এই ‘এক ডোরে বাঁধা’ নাটকের প্রথম দৃশ্যে বাণী ভারতীর জাতীয় সংহতিবহ পরিকল্পনা এইরূপ— ‘‘চারিদিক থেকে বিভেদ যেন কুষ্ঠরোগের মত ফুটে উঠেছে। কি আশ্চর্য কথা— মানুষ যদি কুঁড়ে ঘরেও থাকে, তবু তার দেয়ালে মাটি লেপে, আল্পনা এঁকে ছবি এঁকে তার ছোট কুটীর খানিকে সুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করে। আর আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসীরা এত বড় সোনার দেশটা হাতে পেয়েও একে সুন্দরতর করে তোলবার চেষ্টা না করে সারা দেশজুড়ে রক্তের ছাপ

এঁকে দিচ্ছি" (কেতন)। একই সংহতির খুর দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এবং এই দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এবং এই দ্বিতীয় দৃশ্যে বানী ভারতীর সাধারণ শিল্পী চরিত্রের মাধ্যমে সংহতিবোধক বাণীর প্রচার ধ্বনিত হয়েছে— "দাঙ্গা আজও হয়, তার কারণ ভারতবাসী তাদের সংস্কৃতিকে ভুলেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লোকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে নিজেদের সাজায়, বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিচয়, তার ধারা সর্বদাই এক"— (কোহিনূর)। এরপর তৃতীয় এবং চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় বানী ভারতীর শিল্প— সংস্কৃতি সংহতি উজ্জীবনের প্রচেষ্টায় নাট্যায়নের যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবলিত ও বিধ্বস্ত আসামের একটি নাট্যমঞ্চে। পঞ্চম দৃশ্যে সাম্প্রদায়িক পরিচয় ফাল্গুনী এবং কোহিনূরের মধ্যে পরস্পর বিপরীত জাত-ধর্মের চরিত্র দুটি প্রেমের আবদ্ধ হতে চলেছে তখন বিলাওল প্রথমে ইসলাম ধর্মের মোহে অন্ধ হয়ে জাতিতত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন জাত ধর্মের সঙ্গে এক করে ভাবনার চিরন্তন সংস্কারটিকে বিসর্জন দিতে অপরাগ হওয়ায় তার একই জাত-গোষ্ঠীভুক্ত ফাল্গুনীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ভাব ফুটে ওঠেছে— "আমি বিশ্বাস করি, ধর্মভেদেই মনের ভেদ হয়, জাতির ভেদ হয়। হিন্দু এবং মুসুলমান কখনই মিলতে পারে না"— (বিলাওল)। নবম দৃশ্যের শেষ পর্বে এই বিলাওলকে ধর্মান্ধতার পক্ষে গণ্ডী ভেদ করে সংহতির মন্ত্রে সঞ্জীবিত ও উদ্বোধিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। তাই সে চোখের জলে সিক্ত হয়ে বিনীতভাবে বলে ওঠে— "আমার চোখের সামনের কালোপর্দা আজ সরে গেল। বুঝলাম কি দৃষ্টি চোখে থাকলে মানুষের কাছে ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভেদ লোভ পায়"— (বিলাওল)। ষষ্ঠ দৃশ্যে বানী ভারতীর নাট্যানুষ্ঠান অন্ধ্রপ্রদেশের একটি শহরের রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছে আর্য-অনার্যের ঐতিহাসিক সংমিশ্রণ সম্পর্কিত ভাবনা পরিস্ফুটিত হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম দৃশ্যে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে বাণী ভারতীর নাট্যায়ণে মৌলভী তন্ত্রের সঙ্গে জাতি-তত্ত্বের যে সংঘর্ষ, তা বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে এবং যেখানে অর্থলোলুপ স্বার্থান্বেষী মানুষদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও পরিকল্পনা মাফিক চক্রান্ত পরিবেশিত হয়েছে। এবং দৃশ্যের শেষ পর্বে লক্ষ করা যায় ধর্মান্ধ মুসলমান ফয়জল উপলব্ধি করেছে— "ঠিক বলেছ বদরী— খাল কাটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু কুমীর ঢুকে পড়েছে। ... চল বদরী চল। যদি বুকের রক্ত দিয়েও দাঙ্গা থামা হয়, তাই থামাব আমি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক"— (ফয়জল)। নবম দৃশ্যে ফাল্গুনী এবং কোহিনূরের বিবাহের দৃশ্যে দেখা যায় অসমজাতের বিবাহ বন্ধনকে ভিত্তি করে মৌলভী তন্ত্রের চিরায়ত সংস্কারের ভীষণ বাধা প্রদান প্রদর্শিত হয়েছে। এবং এই বাধার হিংস্বাত্মক ও আক্রমণাত্মক আঘাতে লক্ষ করা যায় বাণী ভারতীর কর্ণধার শঙ্করণ ভীষণভাবে আহত, কোহিনূরের আব্বাজান মুস্তাফাতও আহত হয়, এমনকি কোহিনূরও সমজাতধর্মের বিলাওলের কাছে গঞ্জনা ও লাঞ্ছনায়

জর্জরিত হয়েছে। নাটকের কাহিনীর পরিশেষে দেখা বিলাওল উগ্র ধর্মান্ধতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে অর্থাৎ সংশোধিত হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানবিকতাবোধে জীবন্ত চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কেতন মুস্তাফা ও শঙ্করণের রক্ত বিলাওলের কপালে মেখে দিয়ে সে বলে— 'হিন্দু মুসলমানের মিলিত রক্তধারা তোমার কপালে লাগিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ ভঙ্গিতে উদ্দীপ্ত হয়ে সে বলে ওঠে— পরিয়ে দিলাম—পাপমোচনের টীকা"— (কেতন)।....লক্ষ করা যায় সংহতির রসে জারিত হয়ে উচ্চাঙ্গ কোরাস সঙ্গীতের সুর ও তালের আন্দোলিত হয়ে চিরন্তন মানবতার জয়গানে নাটকটি সমাপ্তি হয়েছে।

'আকাশ ভরা তারা' নাটকটিতে ৯টি দৃশ্য পরিবৃত্ত হয়ে ডা: বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর এই মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটকটির নাট্যবেষ্ঠনী গড়ে তুলেছেন। নাটকের চরিত্রগুলি নাডেজ দা চেকালীনা, আলেকজাণ্ডার সুভারোভ, আন্দ্রেই আলেক্সি, ভেরা, ভিট্যা, ভ্যাসিয়া লিওনিদ, ট্যানিয়া, পেরাকোভ চেইকফ, ব্রাইনিন, গাভরুস, তওয়ারি শি, প্রেটনিন প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ যেমন করে ফুটে ওঠেছে, সেই সঙ্গে ঘটনা ও চরিত্রের সমন্বয়ে যথার্থ ঐতিহাসিক নাট্য মুহূর্তের উদ্ভব হয়েছে।

নাটকটির কাহিনী বিন্যাসের শুরুতে লক্ষ করা যায় জার্মান দেশের প্রবলতর আক্রমণে রাশিয়ার প্রকৃত দেশপ্রেমের জোয়ারে শেষপর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই দেশপ্রেমের সংহত শক্তি সমস্ত বিরোধী শক্তিকে সমূলে পরাভূত করে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দেয়। আলোচ্য নাটকটিতে এই সুমহান দেশপ্রেমের কথা ফুটিয়ে তোলাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

রাশিয়ার সৈনিকবৃন্দের সুতীব্র যে দেশপ্রেম দেখা দিয়েছিল তা ব্যক্তিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিখুঁত নাট্যমুহূর্ত তৈরি হয়। জার্মান সৈন্যদের নারকীয় বীভৎস অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতি দর্শকদের আবেগ মূলতঃ প্রতিহিংসা ও ঘৃণার উদ্রেক করে, অপরদিকে লক্ষ করা যায়, রাশিয়ার গৌণফৌজের সুকঠিন আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দর্শকদের আবেগে শ্রদ্ধা ও করুণার জাগরণ ঘটায়। এমনকি গণফৌজের জয়ে আপ্লুত দর্শকের আনন্দ উল্লাস একাত্মতার অনুভূতির ধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় দর্শকের মন ও হৃদয় জগতের সঙ্গে চরিত্রগুলির সাধারণীকরণ ঘটে। আর এর মধ্য দিয়েই নাটকটির নাট্যবন্ধন সার্থক হয়েছে। তবে আলোচ্য নাটকে ইতিহাসের কাহিনী যে পরিমাণে উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সঙ্গে কল্পনার বিস্তৃতিও সেই পরিমাণে পরিবেশিত হওয়ার কাজে নাটকটি যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক রূপে চিহ্নিত হতে পারেনি। এমনকি এই নাটকটির নামকরণও সেই ইঙ্গত বহন করায় সার্থক ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে মর্যাদা লাভ করতে পারেনি।

'কাটা মন্ডুরা কথা কয় ও একাঙ্ক গুচ্ছ' নাট্যসংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন— ''আলোচ্য নাট্যসঙ্কলন গ্রন্থে রয়েছে চারটি একাঙ্ক নাটক যথা— ১. কাটা মন্ডুরা কথা কয় ২. জলের তলায় আগুন ৩. সোনার সাহারা ৪. জাল নোট। এই চারটি নাটকের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ নাটকটি বিভিন্ন একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে।... নাট্য-অগ্নি-পরীক্ষায় নাটক তিনটি সসম্মানের উত্তীর্ণ। প্রথম নাটকটি (কাটা মন্ডুরা কথা কয়) কোন নাট্য প্রাতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে কি আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত নেই। তাই নাটকটি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য রাখছি। ধনতান্ত্রিক... কাঠামোতে কিছুটা সমাজতান্ত্রিক আলপনা দিয়ে যে সোনার পাথর বাটি তৈরি করে দেখান হচ্ছে, তার রঙটা সোনালী হলেও ঐ পাথর বাটিটা সোনার হয়নি, পাথরই রয়ে গেছে। আর, তারই ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অনাচার ও ব্যভিচার চলছে, তাতে জনজীবনে আজ চরমতম এই অশান্তি।... শ্রীযুক্ত বাগচী 'কাটা মন্ডুরা কথা কয়' এই একাঙ্ক নাটকটিতে আদ্যোপান্ত বিষয় জনজীবনের একটি মর্মন্তুদ বাস্তব আলেখ্য রচনা করেছেন। আজকের সমাজ জীবনে এই আলোখ্য যেভাবে আলোকপাত করেছে, তা যেমন হয়েছে নাটকীয়, তেমনি হয়েছে মর্মস্পর্শী।''

এই নাট্যসংকলের প্রতিটি একাঙ্ক নাটক কাহিনীধর্মী। নাট্যকার কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাঁর নাটকের বক্তব্য বিষয় দর্শক সমাজের কাছে উপস্থাপন করেছেন। আবার সহজ রূপকের আড়ালে প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য পাঠকের বোধগম্যতার ক্ষেত্রে উপযোগী হয়েছে।

'কাটা মন্ডুরা কথা কয়' একাঙ্ক নাটকটির মুখ্য প্রতিপাদ্যবিষয় হল মূল বা কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরু মস্তানের মানসিক প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত গ্লানি তারই খুন করা চরিত্রগুলির ভিতর দিয়ে যখন ব্যক্ত হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই নুরুর অপরাধবোধের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই নাটকটির প্রধান চরিত্র নুরু। অন্যান্য অপ্রধান চরিত্র মিত্তির, বগা, সুরেশ, প্রবীর,গনি, পরী, লতিফ, বিলে, ফেকু প্রমুখ।

এই নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরু সামাজিক অনাচার, ব্যাভিচার ও স্খলনের সামগ্রিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে খুনীরূপে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ কঠোর সমস্যার মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলেও স্বাধীনোত্তর পর্বেও ভারতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অনাচার ও ব্যভিচার চলমান, এর ফলশ্রুতিতে জনজীবন চরমতম অশান্তিতে পরিপূর্ণ এবং মানুষ হয়ে পড়ছে ন্যায়নীতি ও সংস্কৃতিভষ্ট তাই নাটকটিতে দেখা যায় নুরু জন্মসূত্রে মাস্তান কিন্তু খুনী নয়। সামাজিক কালে হাতের শিকারে পরিণত হয়ে সে খুন করেছে তারই স্নেহ-পুষ্ট বর্গা, সুরেশ, প্রবীর প্রমুখ সমাজের নানা স্তরের মানুষ। এবং তার এই অপরাধমূলক কর্মের পেছনে রয়েছে সামাজিক নেতৃত্বের হাত। এমন অবস্থায়

নুরুর মনোজগতে নানারকম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তার নেশা কেটে গেলে তার ভিতরের খুনী সত্তা নিষ্প্রভ হয়ে তার মধ্যে সাধারণ মানুষের মতো জেগে ওঠে স্নেহপরায়ণ কোমল সত্তা — এখানে তার অপরাধবোধের cathersis ঘটে এবং তার দ্বারা খুন হওয়া চরিত্রগুলি তার সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে কৈফিয়ৎ তলব করে— যা নুরুকে চরম দ্বিধাগ্রস্থ করে তোলে। তাই শেষপর্যন্ত সে নেশায় ডুবে যায়। সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে এইসব ঘটনার পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে নুরু চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সজীবতা লাভ করে।

'সোনার সাহারা' নাটকটিতে প্রধান চরিত্র উদাস, এবং অন্যান্য অপ্রধান চরিত্র লোভেশ, ইবলিশ, কেঁদো, দোজোখ, উল্‌ফ্‌ প্রভৃতি মানুষ যখন একা একা যাবতীয় সম্পদ ভোগ করবার তৃষ্ণায় মেতে ওঠে তখন তার সত্তায় হিংস্রতা প্রবলভাবে ক্রিয়া করে এবং পরিণতিতে পরস্পরের মধ্য সম্পদ নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বের ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়েও ঐ তৃষ্ণা দূর হয় না।

'জলের তলায় আগুন' একাঙ্ক নাটকটি মানুষের অন্তরে নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে একান্তে জমে ওঠা ক্ষোভ, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির ভাগ্যের নিদারুণ আঘাতে পঙ্গু হয়ে ওঠে, পাড়া, পরিশেষে বিকল হয়ে পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে বিচলিত ও দ্বিধান্বিত— এই রূপ সংকটাপূর্ণ টানাপোড়ের মধ্য দিয়ে ঈর্ষার জ্বলন্ত শিখায় পুড়ে তলিয়ে যাওয়ার বেদনায় বিমর্ষ হয়ে ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ— নাটকটির মূল্য উপজীব্য।

এই নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র রবি। আর অপ্রধান চরিত্র হল— জটা, অরুণ, পুষ্পিতা, করবী প্রমুখ। রবি ভাগ্যের নির্মমতার শিকার কারণ সে যখন ছাত্রজীবনে যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছিল তখন বন্ধু অরুণ তার ধারপাশেও ভিড়তে পারেনি। অর্থাৎ অরুণ কখনই রবির হিসেবের মধ্যেও ছিল না। অথচ তার বন্ধু অরুণ প্রসন্ন ভাগ্যের অধিকারী। সে ভাগ্যের জোরে জীবনে সফলতা অর্জন করে সুখকর জীবন-যাবন করে। অর্থাৎ কিনা অরুণ অপ্রত্যাশিত চাকুরী ও সুন্দর স্ত্রী নিয়ে আনন্দে দাম্পত্য জীবন কাটায়। অপর দিকে রবি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে লোকের দয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জীবনমৃত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে। মোটকথা ভাগ্যের এই বিরুদ্ধাচরণে ও নিষ্ঠুরতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে সে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এমনকি শৈশবের বন্ধু অরুণ তার অন্তরে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে তাকে মর্মপীড়ায় পীড়িত করে তোলে। নাটকের পরিনামে লক্ষ করা যায় আক্রোশের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে রবি অরুণের উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে বলে ওঠে— 'তুমি-তুমিই সব পাবে— সব পাবে— না-না-না— ।" ভোগকরলে— সবারই তৃপ্তি সম্ভব— তাই নাটকটির উপজীব্য।

'সোনার সাহারা' নাটকটিতে অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থায় সাহারা একটি প্রতীক চিত্রের নিদর্শন রূপে উপস্থাপন হয়েছে, যে 'সাহারা' মতো অবক্ষয়িত সমাজের বুকে সোনার অর্থাৎ বাঁচার তাগিদে

প্রতি প্রত্যেকটি মানুষ বা জীবসত্তা শুধুই নিরন্তর ছুটছে। অর্থাৎ বাঁচার প্রয়োজনে এই চলমানতার গতি থেকে কেউই বাদ যায়না। মোটকথা এই ছুটে চলার চিরন্তন প্রবাহমানতা থেকে কেউ বিরত থাকে না— সে সাধুই হোক আর ছিঁচকে ডাকাত দলের সর্দার ইবলিস কেদো দোজোখ উল্‌ফ্‌ দেখা যায়, প্রত্যেকে লোভের বিষচক্রে প্রবলভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং সকলের মধ্যে জেগে ওঠা লোভ— প্রবৃত্তি শেষপর্যন্ত সর্দার ইবলিসের মুখে রূপকের আবহে প্রতিধ্বনিত হয়েছে এইভাবে— ''আঃ আমার সোনা— আমার সোনেকা চিড়িয়া— আঃ আমার- সো-না। অর্থাৎ লোভের সুতীব্র টানে বশীভূত হয়ে চরিত্র পারস্পরিক বিনাশের পথে ধাবিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নাটকটির সমাপ্তি ঘটে।

'জাল নোট' একাঙ্ক নাটকটিতে সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সমাজের সামগ্রিক স্খলনের চিত্র। অপরদিকে আলোকজ্জ্বল উত্তরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশও করা হয়েছে। রত্ন মজুমদার চরিত্রটি এই একাঙ্ক নাটকে প্রধান চরিত্র। এবং বিপ্রদাস, ফণী, উত্তম, তপু, ওসমান, অতীন, রামসিংহ প্রভৃতি চরিত্র অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকায় চিত্রিত।

আলোচ্য নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র রত্ন মজুমদার শিল্পীর রূপকে অর্থের লোভে বশীভূত হয়ে জাল নোটের মাধ্যমে লোভের জাল ছড়াতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এবং তার এই অপরাধমূলক কর্মে অর্থাৎ অর্থকরী শিল্পের পরিপূরক চরিত্ররূপে স্ত্রী শিখাও এগিয়ে এসে পুরোপুরিভাবে জড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ শিখা শিল্পী রত্নকে নোট জাল করার পথে পা বাড়াতে সাহায্য করে। এর পরিণামে রত্ন তার সৃষ্টির মতো একটা মাত্র জাল নোট-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়। এবং এই অন্যায় পথে ধনী সাজতে গিয়ে রত্ন মজুমদার সমাজ, রাষ্ট্রকে ঠকিয়ে দাগী মানুষে পরিণত হয়। পরিশেষে রত্ন ও শিখা এই অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়ে শেষপর্যন্ত দেশের গ্লানিকর বাস্তব অবস্থা দেখে নতুন করে বাঁচার তাগিদে রত্ন শিখাকে বলে ওটে— ''...এরা সবাই ত দেখছি জাল নোট। তবে আমি কেন মরতে যাব? বরং সব অতীত মুছে দিয়ে গরীব শিল্পীর সত্তা নিয়ে নূতন জন্ম লাভ করি।''

মোটকথা, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে ব্যক্তি জীবনের তথা সমাজ-জীবনের বহুবিধ সমস্যা সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে উক্ত একাঙ্ক নাটকগুলিতে উপস্থাপিত হওয়ায় চারটি নাটকই সার্থক সামাজিক একাঙ্ক নাটক রূপে অভিহিত হয়েছে।

'গোধূলী' একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। মূল গল্প: গোধূলী— পরিতোষ চন্দ্র গুহ, নাট্যরূপ: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ে (১৯৯৩ খ্রি:)। প্রকাশনায়-গ্রুপথিয়েটার পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা পৃ. ৭৩, প্রকাশনার কাল মে-জুলাই ২০১৫।

আলোচ্য নাটকটিতে ৯টি দৃশ্য রয়েছে। এই নাটকটির চরিত্রগুলি হল গোধূলী, হরো, বিজানু,

কর্মকার, অতুল, হৃষিকেশ, রূপচাঁদ, বলদেব, সদানন্দ, পচমা, হিমানী, ডাক্তার, ১ম গ্রামবাসী, ২য় গ্রামবাসী, ৩য় গ্রামবাসী প্রভৃতি। গোধূলী এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে আয়ত্ত করে অন্যান্য চরিত্রগুলি প্রকাশের পরিপূর্ণতা লাভ শ্রীমতি (ছিরামতি) নদীতে সেতু নির্মাণের কাজকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা বাধ্য হয়ে রেজি বা দিনমজুরীর কাজে যুক্ত হওয়ায় তাদের অভাবতাড়িত দৈনন্দিন দুরবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এবং অন্যান্য নানা অবৈধ উপায়ে ঠিকাদার কর্তৃক সাধারণ অসহায় মানুষ কীভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হয় তার বাস্তবসম্মত চিত্র ফুটিয়ে তোলাই নাটকটির মূল উপজীব্য।

এই সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র গোধূলী কালিয়াগঞ্জ থানার প্রত্যন্ত গ্রামের সাদামাঠা গৃহবধূ। সংসারের দৈনন্দিন অভাব ও অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্য গোধূলী বাধ্য হয়ে চৌধুরী ঠিকাদার ফার্মে স্বামী হরোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেজিনের (দিনমজুরীর) কাজে যুক্ত হয়। হরো স্ত্রী গোধূলীর মরদ কুলীকানীন আর মিস্ত্রিগুলার সাথে মসকরা, ঢলাঢলি পছন্দ না হওয়ায় তাকে ছিনাল (চরিত্রহীন) বলে ভর্ৎসনা করায় গোধূলী স্বামীর ঘর ছেড়ে চিরতরে বাপের বাড়ি যেতে প্রস্তুত হলে স্বাভাবিকভাবে হরো মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে। এতে গোধুলী নিরুপায় হয়ে বাপের বাড়ি যাওয়া স্থগিত রাখে। অপরদিকে ক্রমশঃ শারীরিকভাবে দুর্বল স্বামীর চিকিৎসার জন্য গুণিন সদানন্দকে দেখিয়ে কোন সুরাহা না হওয়ায় স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কথা মতো অর্থের সন্ধানে উক্ত ফার্মের ওয়ার্ক সাইটের লোভী ও অসৎচরিত্রের কর্মচারী নিখিল কর্মকারের কাছে দু হাজার টাকা ধার চায়। নিখিল কর্মকার ভিটাজমি বন্ধকি রেখে গোধূলীকে টাকা দেয় এবং তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মান-ইজ্জত হরণ করে— এইরূপ অবস্থায় বিরুদ্ধ ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত অপমানিত গোধূলী সর্বস্ব খুইয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরলে স্বামী হরোর আদেশে বিছানু ও গ্রামবাসীরা কর্মকারের উৎপীড়ন তথা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে প্রতিবাদে সরব হয়ে রুখে দাঁড়ায়।

এইনাট্যকারের অন্যান্য নাটক: 'উত্তরাধিকার' (পূর্ণাঙ্গ), সূত্র: নটরাজন, নাট্যরূপ : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছন্দমের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়। সমুদ্র মন্থন (পূর্ণাঙ্গ), সূত্র: ইন্দু সাহা, নাট্যরূপ : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

'যতীনবাবুর চাকর' ৯টি দৃশ্য সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। মূলগল্প: 'যতীনবাবুর চাকর' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্যরূপ: সুব্রত রায় (১৯৮৬ খ্রি:) এই নাটকটি প্রকাশিত হয়নি তবে মঞ্চায়নের সাফল্য লাভ করেছে। রায়গঞ্জ, ছন্দম গ্রুপ থিয়েটার সংস্থঅর প্রযোজনায় নাটকটি নিজস্ব মঞ্চে ১৯৮৮ খ্রি: মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও নাটকটি কলকাতার গিরিন্দ্র মঞ্চে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ

এবং বালুরঘাট 'ত্রিতীর্থ' মঞ্চে প্রভৃতি মঞ্চে সার্থক মঞ্চরূপ লাভ করেছে।

নাটকটিতে ১৭টি চরিত্র— সত্যরাম, হারান, অনিল, ধরনী, পানু, দাক্ষী, বলাই, ফটিক কেষ্ট, পুন্য, নরেন, কালিকানন্দ, যতীন মণ্ডল, শান্তি, কানু, উপেন সাধু, দীনু এছাড়াও ৮ জন গ্রামবাসী। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র পানু। প্রতিনায়ক চরিত্র যতীন মণ্ডল এবং প্রধান প্রতি পার্শ্বচরিত্র সত্যরাম। সহকারী চরিত্র: হারান, অনিল, ধরনী, বলাই, ফটিক, কেষ্ট, নরেন, কানু, শান্তি প্রভৃতি। সহায়ক চরিত্র: কালিকানন্দ (যতীনবাবুর গুরুদেব), উপেনসাধু, দীনু, ৮জন গ্রামবাসী প্রভৃতি। নাটকটির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়: গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনে সামন্ত প্রভু তথা দেশীয় জোতদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি সাধারণ অসহায় মানুষদের দৈনন্দিন অভাব ক্লিষ্ট জীবন অমানবিক শোষণ, নিপীড়ণ ও বঞ্চানার নিষ্পেষিত করে তুলেছিল তার জীবন্ত নিদর্শন বিধৃত হয়েছে।

আলোচ্য নাটকে নানাবিধ ঘটনার সুকৌশল বুননের সূত্র ধরে নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে। জোতদার যতীন মণ্ডলের ম্যানেজার সত্যরাম খুব যত্নসহকারে জোতদারের বিশাল সাম্রাজ্য দিশেষ করে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ দেখভাল সহ জোতদারের নাম করে অসহায় জনপাইট বা শ্রমজীবী শ্রমিক বলাই, কেষ্ট, ফটীক, পুন্য ও পানুদের অপরিসীম কায়িকশ্রমের ফসল ফলান, বিনিময়ে সেইসব শ্রমিকদের আহার ও দরমার ব্যাপারেও যথেষ্ট সংকুলানের মাধ্যমে তাদের শোষণ ক্রিয়া বজায় রাখেন, আবার গ্রামের অধিবাসীদের সুদখোর মহাজনী কায়দায় শোষণ অবাধে চালিয়ে যান। অপরদিকে যতীনবাবু সরকার মনোনীত বাগঢোলের জমি চক্রান্ত করে দলিল করার জন্য দীনু লাঠুয়াকে কাজে লাগায়। দীনু জোতদারের মনোবাঞ্ছা পূরণের লক্ষ্যে পানু ও তার দাদা কানুর বাগঢোলের পৈতৃক সম্পত্তি জোরপূর্বক দখলের জন্য তাদের নিয়মিত শাসন ও গর্জন করতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে ঘটনার পরিণতিতে দেখা যায়, যখন দীনু পানুর উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করে তখন পানু বাধ্য হয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আঘাত করে। এর পরিণামে দীনু মারা যায় এবং পানু কারারুদ্ধ হয়। মোটকথা জোতদার তথা সামন্তপ্রভু যতীনবাবুর নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পানুর জীবন চরম করুণবিদার ও দুঃখ দুর্দশাময় অবস্থার সম্মুখীন হয়।

এই নাট্যকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক: 'দহন' (পূর্ণাঙ্গ), সূত্র: মূলকাহিনী 'কালরাত্রী'— দুলেন্দ্র ভৌমিক, নাট্যরূপ: সুব্রত রায়। ১৯৯৭ খ্রি: ছন্দমের প্রযোজনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

'ক্যানে ক্যান্নে' নাট্যকার নৃপেন্দ্র নাথ মহন্তের (১৯৯২খ্রি:) লেখা একটি সামাজিক একাঙ্ক নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয়নি। তবে হেমতাবাদ সাংস্কৃতিক মঞ্চের প্রযোজনায় কালিয়াগঞ্জের 'নজমু নাট্যনিকেতন' মঞ্চে (২০০৮) খ্রি: এবং চন্দন নগর 'রবীন্দ্রভবন' মঞ্চে (২-৭ই জানুয়ারী

২০০৯খ্রি:) মঞ্চস্থ হয়।

মংলী, হালিম, আকালু, দুলালি, জোলেখা, বেলা রায়, বুলির মা— এই সাতটি চরিত্র এবং সমাজ সচেতনার বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটকটির অবয়ব গড়ে উঠেছে। মংলী এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র দুলালী প্রধান পার্শ্বচরিত্র। গ্রামীণ সমাজ জীবনে আপামর সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য-সচেতনতাবৃদ্ধি, সাক্ষরতার প্রাসঙ্গিকতায় ইতিবাচক মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা এবং কুসংস্কারের নাগপশে ছিন্ন করে সুস্থ ও সাবলীল জীবনবোধে উত্তীর্ণ করে তোলাই নাটকটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রামে অতিসাধারণ কৃষক রমণীর মেয়ে জোলেখা শৌচালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় বাইরে প্রাতঃকৃত্য সারতে যেতে না হয়— যা সমাজে নিন্দনীয়। দুলালীর কথায় মংলী স্বাস্থ্যকর্মী বেলা রায়ের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তার স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যেমন— বিশেষ করে গৃহে পাকা পায়খানা, বিভিন্ন রোগের কারণ ও নিরাময়, সাক্ষর হয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বনির্ভর দলে অংশগ্রহণ এবং কুসংস্কার দূরীভূত করে সংসার-সমাজ-দেশকে মুক্ত করে সকলে সমবেতভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠা। এইভাবে মংলীসহ গ্রামের সকলে যথার্থ জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রচিত নাটকগুলির বিষয়বস্তুগত (ভাববস্তুর) বর্ণনা ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস:

বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমার থিয়েটারের ঐতিহ্যবাহী শিল্প সংস্থা ‘বালুরঘাট নাট্যমন্দির’কেই বোঝায়। এমনকি উত্তরবঙ্গে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের জন্যই বালুরঘাট ‘নাটকের শহর’ বলে সর্বজন স্বীকৃতি ও পরিচিতি লাভ করেছিল। তাই বালুরঘাটের নাট্যচর্চা সমগ্র বাংলাজুড়েই প্রশংসিত ছিল একটি বিশেষ কারণে, তা হল বাংলা নাট্যসাহিত্যের একাঙ্ক নাটকের জনক ও বিশ্ববন্দিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাট্যসাহিত্য সৃজন পর্ব শুরু হয়েছিল ‘বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে’র (এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব এ) নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করে। বালুরঘাটের কৃতি ও যশস্বী সন্তান মন্মথ রায়ের নাম বালুরঘাট মাটির সাথে, এই নাট্যমঞ্চের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মোটকথা, বালুরঘাটেই তাঁর যুগান্তকারী নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ হয় এবং তাঁর জগতজোড়া নাট্যপ্রতিভার গুণেই বালুরঘাট বর্তমানে বাংলা নাটকের চিরন্তন পূণ্যতীর্থের খ্যাতি লাভ করে।

মন্মথ রায়ের জন্ম হয় ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল থানার অন্তর্ভুক্ত গালা গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশ) ১লা আষাঢ়, ১৩০৬ (ইং ১৬ই জুন, ১৮৯৯), পিতা দেবেন্দ্রগতি রায় ও মাতা সরোজিনী রায়। মন্মথ রায় ছয় বছর বয়সে ঠাকুরদা গুরুগতি রায়ের হাত ধরে বালুরঘাটে ১৩১৩ সনে (ইং ১৯০৫) চলে এলেন নাটকের সংস্কার নিয়ে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মন্থথ রায় অতিশৈশবে

এই গালা গ্রামে অভিনীত 'বিসর্জন' নাটকে 'ধ্রুব' বেশে প্রথম অবতরণ করেন। তাই তিনি তাঁর স্মৃতি কথায় জানিয়েছেন— ''ঐ বয়সেই (পাঁচ-ছ বছর বয়সেই) থিয়েটারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে গেল। হ্যাঁ, ঐ গালাতেই।''[১] জন্মসূত্রে টাঙ্গাইলের মানুষ হলেও অধিবাসীসূত্রে তিনি পরিবারসহ বালুরঘাটের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হন। বালুরঘাটে স্থায়ী নাট্যশালা তখনও স্থাপিত হয়নি কিন্তু অস্থায়ীভাবে মঞ্চ তৈরি মঞ্চে নাট্যাভিনয় তৎপরতা শুরু হয়ে বেশ সুস্থ-সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। আজন্ম নাট্যপ্রিয় বালক মন্মথ রায় প্রথম থেকেই নাটকের অভিনয়ে জড়িয়ে পড়েন এবং সর্বোপরি সংস্কৃতি প্রিয় পরিবারের সহযোগিতা ও সান্নিধ্যে তিনি শৈশবেই নাট্যভিনয়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাই পরিবারের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার সুবাদে থিয়েটারের বই পড়ার পাশাপাশি ছাত্রাবস্থা থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষভাবে যোগসাধন ঘটেছে বালুরঘাটে। অর্থাৎ তিনি যখন বালুরঘাট হাইস্কুলে অষ্টম বা নবম শ্রেণীতে পড়তেন, তখন হেডমাস্টার পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী স্কুলে 'ডাকঘর' নাটকে তাঁকে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করান। এই ভূমিকায় অভিনয়ে যেমন নাম হয়েছিল ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক সাংকেতিক নাটকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটার ফলে এর প্রভাব তাঁর পরর্বতী সৃষ্টি জীবনে প্রতিফলিত হয়। বাড়ির পাশেই কালীবাড়ির কালীপুজোয় প্রতিবছর যাত্রাগান হত। এখানেই কলকাতা থেকে আগত মথুর সাহার যাত্রাদলের অভিনীত 'পদ্মিনী' পালা বালক মন্মথ অন্যান্য বালকদের সঙ্গে অভিনয় দেখে অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাই শৈশবেই তিনি দু'পাতার 'রাণী দুর্গাবতী' নামে একটা নাটকই লিখে ফেলেন। ''এবং এতেও তৃপ্ত না হয়ে দু'পাতার একটা নাটকই লিখে ফেললাম আমি। যার নাম দেওয়া হল 'রাণী দুর্গাগতী;যার যুদ্ধেই শুরু এবং অনেক অস্ফালন, অনেক পতন, অনেক উত্থানের পর যুদ্ধেই শেষ, হ্যাঁ ... 'রানী দুর্গাবতীই আমার প্রথম নাটক।''[২] যে মন্মথ রায়ের গালা গ্রামের স্বগৃহে নাটক অভিনয়ে প্রথম দীক্ষা হয় বালুরঘাটে এসে তার অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে বিধাতা দেওয়া প্রতিভার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হয়। তাই একথা বলা যায় যে, বালুরঘাটের মতো এই ছোট্ট শহরে তাঁর নাট্যপ্রতিমার স্ফূরণ হয়। তিনি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বালুরঘাট উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে আই.এ. পড়ার জন্য রাজশাহী কলেজে ভর্ত্তি হলেন। এখানে পড়ার সময় গিরিশ ঘোষের 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে দণ্ডীরাজের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা লাভ করেন। বালুরঘাট থেকে পড়াশুনার সুবাদে বাইরে থাকলেও বালুরঘাটের নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত ছিলেন। যতদূর জানা যায় তিনি কলেজের ছুটির অবকাশে বালুরঘাটে এসে বন্ধুদের নিয়ে 'ভ্যাকেশন ক্লাব' নামে একটি ক্লাব স্থাপন করে পরপর দু বছর অতুলানন্দ রায়ের 'পাণিপথ' এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নূরজাহান' নাটক দুটি 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব'-এ সাফল্যের

সঙ্গে অভিনয় করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন— ''আমার নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয় শুধু যে হাতই পাকালাম তা নয়, নাটক লেখার সলতে পাকানো সেই থেকেই যেন শুরু হল।''[৩]

শুধুমাত্র অভিনয় নয়, এই বালুরঘাটে নাটক লেখার প্রচেষ্টাও শুরু হয়। অর্থাৎ তিনি তখন অভিনেতা নয়, নাট্যকারও বটে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ পাশ করে কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের বি.এ.ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে 'বঙ্গে মুসলমান' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। এই নাটকটির সমসাময়িক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, সে সময় কলকাতার জনপ্রিয় মঞ্চগুলির নিজস্ব নাট্যকার বিশেষ ছিল না। তখন মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র মহকুমা শহর বালুরঘাটে একজন নাট্যকার। সেক্ষেত্রে এই ঘটনাটি ছিল যথেষ্ট অর্থবহ। মূলত বালুরঘাট শহরের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গঙ্গারামপুর থানার পুনর্ভবা নদীর পশ্চিম অংশে অবস্থিত নারায়ণপুর গ্রামে মধ্যযুগের বাংলার উল্লেখযোগ্য তুর্কি শাসক ইফ্‌তিকার উদ্দীন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর সমাধির স্মৃতিতেই অনুপ্রাণিত হয়ে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় কাহিনী অনুসরণ করে এই নাটকটি লিখলেন। এই নাটকটি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যাকেশন ক্লাবের প্রযোজনায় এবং মন্মথ রায়ের পরিচালনায় এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক হলে (বর্তমানে বালুরঘাট নাট্যমন্দির) রাত দশটায় অভিনয় শুরু হয়। কিন্তু দেখা যায় নাটকটি এত দীর্ঘ ছিল যে, তদানীন্তন দর্শকরা দীর্ঘ পঞ্চাঙ্ক পাটক পছন্দ করেন জন্য পঞ্চাঙ্ক নাটকের অভিনয়রীতি মেনে বহু সিন (চিত্রপট) বদলাতে বদলাতে অভিনয়ে বাঁধা আসার ফলে রাত্রি শেষ হয়ে পরের দিন সূর্য উদিত হল কিন্তু নাটক সমাপ্ত হল না। এর ফলে দর্শকরা ক্ষুব্ধ হয়ে একে একে নাট্যগৃহ পরিত্যাগ করে বিদ্রূপের সুরে বলতে লাগলেন— ''নাট্যকার বটে, সূর্যোদয় উঠিয়ে ছেড়েছে।'' ব্যর্থতার মধ্যেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে হীরক জয়ন্তী উৎসবে (১৯৭৩) প্রধান অথিতি হয়ে বালুরঘাটে এসে তাঁর স্মৃতিকথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন— এই নাট্যমন্দিরের প্রতিটি ইট কাঠ তার স্নেহের বাঁধনে বাঁধা।'' অর্থাৎ নাট্যকার মন্মথ রায় এক সময় অন্যান্য বালকদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ইঁট ভাটা থেকে ইঁট মাথায় করে বহন করে নিয়ে এসে এ নাট্যমন্দির গড়ার কাজে মেতে উঠেছিলেন অথচ এখানেই তাঁর প্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটকের নিষ্ফল অভিনয় হল। মোটকথা, তাঁর পঞ্চাঙ্ক নাটক 'বঙ্গে মুসলমান', ''নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হল। নাটকটির মঞ্চ ব্যর্থতার কথা বালুরঘাটের এক সমাবেশে বলেছিলেন— 'বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় কাহিনী অনুসরণে ছাত্রাবস্থায় লেখা 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকটির অভিনয় আরম্ভ করা হয় রাত দশটায় এবং পরের দিন সূর্য উঠে যায় তবুও নাটকটির যবনিকাপাত হয় নাই। শেষ দৃশ্য অভিনয়ের সময় দেখা যায় প্রেক্ষাগৃহে লোক

নেই— ঝাড়ুদার এসে দাঁড়িয়ে আছে ঘর ঝাঁট দিতে।”[৪] এই বেদনাময় অভিজ্ঞতা থেকেই নাট্যকার নাটক লেখার রীতি উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন অল্প সময়ের মধ্যেই নাটক লিখে দর্শকদের মন জয় করতে হবে। এবং তাঁর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হল এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব থেকেই। এ ঘটনাটিই ছিল তাঁর বাংলা নাটকের প্রথম একাঙ্ক নাট্যকার রূপে তৈরীর প্রথম সার্থক পদক্ষেপ। তিনি দর্শকদের এই বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন— ‘এ বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যটি আমার নাট্যজীবনে সত্যই সূর্যোদয় ঘটিয়েছে।’ এরপর জানা যায় যে, নাট্যকার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশ চার্জ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ও ল পড়ার সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পরিচালক ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (এম.এ, ডি. লিট্) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, তাঁদের বাৎসরিক উৎসবে নিজেদের রচিত নাটক অভিনয় করতে। মোটকথা তিনি ছাত্রদের নাটক রচনায় উৎসাহ দেওয়ায় নাট্যরসিক মন্মথ এ সুযোগ গ্রহণ করে এবং বালুরঘাটে এসে সাতদিনের মধ্যে এক ঘন্টা-দের ঘন্টার অভিনয়োপযোগী এক দৃশ্যের ‘অম্বা’ নামে একটি একাঙ্কিকা লেখেন এবং ছুটির শেষে ঢাকায় গিয়ে ড. সেনগুপ্তকে নাটকটি পড়তে দেন। ড. সেনগুপ্ত নাটকটির বিষয় ও আঙ্গিকের নতুনত্ব উপলব্ধি করেন ও নাটকটি পড়ে মুগ্ধ হলেন। তখন তিনি বললেন এতে আছে মোট সাতটি চরিত্র। কিন্তু ছাত্রদের জন্য অভিনয় অন্তত কুড়ি-পঁচিশটি চরিত্র চাই। কারণ সবাই অভিনয় করতে চায়। তাই তিনি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশ করবার চন্য চেষ্টা করবেন বলে নাটকটি কলকাতায় নিয়ে যান। ড. সেনগুপ্ত কলকাতা থেকে ফিরে এসে নাট্যকারকে আশ্বস্ত করে বললে নাটকটি ভারতবর্ষে প্রকাশ করা হল না এ কারণে যে, আর থিয়েটারের ডিসেক্টর হরিদাস চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন তাঁরা নাটকটি বড় দিনের ছুটিতে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলেন। স্টার থিয়েটারের মালিক নতুন ভাবনা ও নতুন আঙ্গিকের নাটক পড়ে অভিভূত হন এবং নাটকটির নাম পরিবর্তন করে ‘মুক্তির ডাক’ দিয়ে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের বড় দিনে ২৫শে ডিসেম্বর স্টার থিয়েটার মঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন। উদ্বোধনে আমন্ত্রিত হয়ে তেইশ বছর বয়সে তরুণ নাট্যকার মন্মথ রায় বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এই প্রথম সংযুক্ত হলেন এবং নাট্যইতিহাসে মুক্তির ডাক বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক রূপে সম্মান লাভ করেন। স্বয়ং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় অভিনয় করেছিলেন কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা প্রমুখ স্টারের শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ। তখন সব থিয়েটারের মধ্যে স্টারের আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশি। তবুও নাটকটি জনপ্রিয় হলনা। দর্শকরা মন্তব্য করলেন— ‘এ আবার কি নাটক। এল আর গেল।’ এবং স্টারের সেক্রেটারি প্রবোধচন্দ্র গুহ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে বললেন— ‘এ যুগের নাটক এটা নয়।’ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নাট্যকারকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, তাঁরা নাটকটি ছাপিয়ে প্রকাশ করবেন। তাই মঞ্চে নাটকটি জনপ্রিয়তা

না পেলেও 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কোম্পানী' নাটকটি বই আকারে প্রকাশ করায় নাটকটির নাম সারাবাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। সুধীমহলে নাটকটির অভিনবত্বে কৌতূহল দেখা দেয়। এই মুক্তির ডাক মঞ্চস্থ হওয়ার পর কলকাতার নাট্যব্যক্তিত্বরা নাটকটির অভিনবত্বে মুগ্ধ হন। এবং সমকালীন পত্রপত্রিকায় নাটকটি যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। তৎকালীন শিশির নাম বহুপ্রচারিত নাট্য পত্রিকা (১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১৩ পৌষ, শনিবার) লিখলো: ছোট একখানি ছবির মত বই। একদৃশ্যে সম্পূর্ণ। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রভাব যখন অপ্রহিত বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, আপামর সাধারণ ভগবান বুদ্ধের অরণ লইয়া মুক্তির মার্গের সন্ধানে ছুটিয়াছিল— আখ্যায়িকাটি সেই সময়কার। একটা কুহেলিকাবৃত শান্তির পথে চলিতে চলিতে যেদিন নাটিকার চারটি নায়ক— নায়িকা হঠাৎ যখন মেঘমুক্ত সূর্যের রূপ দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের জীবনের গতি এক ভীষণ অভিশাপ তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া গেল। তখন বুদ্ধের মুক্তিমন্ত্র গ্রহণ করা ছাড়া আর কাহারই কোন উপায় রহিল না। শেষপর্যন্ত দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়া পারে এই নাটকখানি।"[৫] সাহিত্য পত্রিকা প্রবর্তক (১৩৩১, আষাঢ়) যা বলেছে তা এখানে প্রণিধানযোগ্য— ''মুক্তির ডাক' নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। পড়িতে পড়িতে মেটারলিঙ্কের মনোভাব এর কথা মনে পড়ে যায়। নাটক খানিতে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।"[৬] সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, সমালোচক ও সবুজপত্র পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী নাট্যকার মন্মথ রায়কে চিঠি লিখে সাধুবাদ জ্ঞাপন করে লিখলেন (১৩/৭/২৪) ''আপনি শুনে খুশি হবেন যে, মুক্তির ডাক আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে, যথার্থই একখানি ড্রামা বাংলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বললেই হয়। আশাকরি আপতি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন।"[৭] এই নাটকটি বাংলা নাটকের সার্থক ও যুগান্তকারী প্রথম একাঙ্কিকা বলে খ্যাতি লাভ করল। মোটকথা, এই মুক্তির ডাক নাটকটির জন্যই তিনি বাংলা প্রথম একাঙ্ক নাটকের জনক হিসেবে স্বীকৃতি পান। এ সম্বন্ধে নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা নিজেই বলেছিলেন— ''ঐ যে ঘা খেলাম তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সংকল্প করলাম এবার থেকে লিখব খুব ছোট নাটক যার সিন পাল্টাতে হবে না আর বহু চরিত্রের ঝামেলাও থাকবে না তাতে। ফলে তাই হল। পরিবর্তিত পরিকল্পনায় সেই নতুন নাটকটি লিখিত হল ১৯২৩ সালে ... নাম 'মুক্তির ডাক'। বাংলার নাট্যের ইতিহাস রচয়িতারা যাকে বাংলার প্রথম একাঙ্ক বলে গণ্য করে অভিনন্দিত করেছেন।" নাট্যকার মন্মথ রায় 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকটির নিষ্ফল অভিনয়ের কারণে আর বৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটকের রচনায় পা বাড়াননি। তাঁর নাট্যজীবনে একাঙ্ক নাটক রচনার এটিই ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিষয়ে নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবনীকার ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী বলেছেন— ''বালুরঘাট নাট্যমন্দির তথা এডোয়ার্ড

মেমোরিয়াল ড্রামাটিক হল হ'ল যুগান্তকারী বাংলা নাটক বিবর্তনের পথে অমূল্য দিশারী। আজ সেই একাঙ্ক নাটিকার পথেই বাংলা নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে।" তাই একথা বলা যায় যে 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক হল' পরবর্তিতে বালুরঘাট নাট্যমন্দির ও বালুরঘাটের মাটিই হলো বাংলা একাঙ্ক নাটকের সূতিকাগার। মোটকথা মন্মথ রায় সুদূর মফস্বল মহকুমা শহর বালুরঘাটের ব্যক্তি হয়েও ছাত্রাবস্থায় তাঁর নাটক কলকাতার শ্রেষ্ঠ থিয়েটার স্টারে অভিনীত হওয়ার সুবাদে মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসেই নাট্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও নাট্যকার মন্মথ রায় বালুরঘাট নাট্যমঞ্চেই নাটক করার, নাটক রচনার ও সর্বোপরি প্রযোজক হিসাবে নিজেকে তৈরি করার প্রথম উৎসাহ পেয়েছিলেন।

মন্মথ রায় জন্মভূমি গালা থেকে কৈশোর ও যৌবন স্তরের কর্মময় ভূমি বালুরঘাটে স্থানান্তরিত হলে এই বালুরঘাট পর্বেই শুরু হয় তাঁর শিক্ষা, কর্মজীবন এবং উজ্জ্বলতম নাট্যজীবন সাধনা, যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গ ছাপিয়ে বৃহত্তরবঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর ফলে তিনি সমগ্র বাংলা জুড়ে সফলতম নাট্যকার রূপে খ্যাতি অর্জন করে— সু উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। এমনকি নাটক ও মঞ্চের প্রতি গভীর টান থেকে তিনি ক্রমশ নাট্যজগতের দিকে ধাবিত হয়ে সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তুললেন বাংলা নাট্যসাহিত্যের একাঙ্ক নাটকের স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ সফলতম নাট্যকার। সেই সুবাদে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'মুক্তির ডাক' রচনা থেকে তাঁর নাট্যসৃজন পর্ব শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে ৬৪টি পূর্ণাঙ্গ ও ২৭৫ টি একাঙ্ক নাটক রচনা করে বাংলা নাট্য সাহিত্যে স্বমহিমায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর এই বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর এই বিপুল নাট্যসৃজন পর্বের প্রতিটি নাট্যপ্রয়াস এখানে আলোচনার পরিসীমায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সেহেতু মন্মথ রায়ের নাট্য প্রয়াসের মূলত প্রতিনিধি স্থানীয় মঞ্চসফল বেশ কয়েকটি নাটকের আলোচনা তুলে ধরছি।

'মুক্তির ডাক' একটি ঐতিহাসিক একাঙ্ক নাটক। একটি দৃশ্যে আলোচ্য নাটকটির কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। এই একাঙ্ক নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে 'মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী' গ্রন্থে। প্রকাশক বসুমতি সাহিত্য মন্দির (বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড), ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, প্রকাশকাল-প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন : ১৩৭৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১লা বৈশাখ: ১৩৯১।

'মুক্তির ডাক' নাটকে বৌদ্ধযুগে বিম্বিসারের রাজত্বকালে সংঘটিত একটি আখ্যান কেন্দ্র করে নাট্যঅবয়ব তৈরী হয়েছে। নাট্যকার মন্মথ রায় নাটকটির ভূমিকায় বলেছেন— ''আমার লেখা

প্রথম নাটক অভিনীত হয় ১৩ ২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে। নাটকটি ছিল একখানি একাঙ্কিকা, নাম 'মুক্তির ডাক'। একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা।"

'মুক্তির ডাক' নাটকটি মন্মথ রায়ের শিল্পসম্মত প্রথম একাঙ্ক নাটক, যা সার্থক আধুনিক একাঙ্ক নাটকের পথিকৃত তথা দিক নির্দেশক এবং নাটকটির বিষয়বস্তু, ভাব, আঙ্গিক ও রসের দিক দিয়ে একটি নিখুঁত নাট্যপ্রয়াস। এই নাটকে পুরুষ চরিত্র ৪টি এবং স্ত্রী চরিত্র ২টি তবে নাট্যঘটনা বিম্বিসার অম্বা, সুন্দরক ও পদ্মা মূলত এই চারটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়েছে। কামনা-বাসনার লেলিহান আকর্ষণে উন্মত্ত বিমূঢ় চিত্তের মোহগ্রস্ততা থেকে উন্মোচন তথা মুক্তির লাভের প্রার্থনা এই নাটকটির মূল্য উপজীব্য।

শ্রেষ্ঠ সুন্দরক তাঁর নিজের স্ত্রী পদ্মার প্রতি অবহেলা করে মগধের অধিপতি বিম্বিসারের প্রণয়িনী বারবিলাসিনী অম্বার প্রতি আসক্ত হয়। পিতার ঐশ্বর্য লাভ করে ধনশালিনী স্ত্রী পদ্মার নিকট সুন্দরক অম্বার দর্শনীবাবদ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা চায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অম্বা সুন্দরকের গৃহে এসে উপস্থিত হয়। পদ্মা অম্বাকে দেখে অপমান বোধ করে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এর ফলে সুন্দরক অম্বাকে তার প্রসাদ-ভবন দান করে স্ত্রী পদ্মাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে দেয়। অম্বার সন্ধানে বিম্বিসার সেই প্রসাদে এসে উপস্থিত হলে পদ্মা তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। তখন বিম্বিসার তাঁর রাজদণ্ড অম্বার হাতে তুলে দেন এবং বিচারের ভার অম্বার প্রতি অর্পণ করে পদ্মাকে আশ্রয় দেওয়ার প্রচেষ্টায় রত হন। ঈর্ষিতা অম্বা রাজদণ্ড হাতে নিয়ে যখন পদ্মার ছিন্নশির সুন্দরকে দেওয়ার আদেশ করে তখন বিম্বিসার অম্বার উদ্দেশ্যে বলেন যে, পদ্মা হল তাদের নিজেদের অর্থাৎ বিম্বিসার ও অম্বার অবৈধ সন্তান। এবং পদ্মা অম্বার পূর্বতন স্বামী সুচিত্রের গৃহে এক ধাত্রীর কাছে মানুষ হয়। সুচিত্র সংসারের প্রতি ক্ষোভে বিস্তৃষ্ণতায় শেষপর্যন্ত সুন্দরকের সঙ্গে পদ্মার বিবাহ দিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় নেন। বিম্বিসার বুদ্ধদেবের চরণে জীবন সমর্পণ করেন এবং তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরই প্রসাদের ভগবান তথাগত সমাগত হয়। অবশেষে অনুতপ্ত অম্বাও ভগবান বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লাভ করে নিজের যথা সর্বস্ব সম্পদ সংঘে প্রকাশ করেন এবং ক্ষমার অবতার বুদ্ধদেবের পাদপদ্মে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে বলেন— আমি-আমি অম্বার ধ্রুবতারার পানে চেয়ে থাকব। করুণাময় বুদ্ধের আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে সকলে সঞ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটকটির সমাপ্তি ঘটে।

'চাঁদসদাগর' মন্মথ রায়ের প্রথম সফল পৌরাণিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। তিনি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আর্ট থিয়েটারের পরিচালক ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কর্ণধার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে পৌরাণিক শৈলীমাফিক পঞ্চাঙ্ক রীতি অনুযায়ী তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি লিখেন। এই নাটকটির

কাহিনী নাট্যকার রামপ্রাণ গুপ্তের (নাট্যকারের দাদামশাই) বাঙালির ব্রতকথা গ্রন্থ থেকে আহরণ করেছেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর নাটকটি স্টার থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই তিনটি অংকের মধ্যে প্রথম অঙ্কে ৬টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্গে ৫টি দৃশ্য এবং তৃতীয় অঙ্কে ৪টি দৃশ্য রয়েছে। এই নাটকটি 'মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক— বসুমতী সাহিত্য মন্দির (বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড), ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২, প্রকাশকাল প্রথম সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৭৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯১।

নাটকটির চরিত্র সংখ্যা মোট ২২টি, যথা মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, যম, ধন্বন্তরী, আস্তীক, বৃশ্চিক, চাঁদসদাগর, লক্ষ্মীন্দর, দুর্যোধন, নেড়া, ধনা মনা, সায় সদাগর, চণ্ডী, মনসা, নেতা, তরুণী, সনকা, অমলা, বেহুলা প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদ সদাগর। এছাড়াও সহায়ক চরিত্র রূপে পুরবাসীগণ, সাপুড়েগণ, পূজারীগণ, দৌবারিক, নগরাধ্যক্ষ, রক্ষিগণ, সর্পসঙ্গিনী গণ, সাপুড়ে-স্ত্রীগণ, দেবদাসী ও সেবাদাসীগণ পুরবাসিনীগণ প্রভৃতি।

নাটকটি সম্বন্ধে নাট্যকার গ্রন্থের ভূমিকায় 'লেখকের কথা' অংশে বলেছেন— ''উল্লিখিত বেহুলার উপাখ্যানে কল্পনার তুলিতে আমার প্রয়োজন মত রং দিয়াছি।'' এই নাটকে মর্ত্যলোকে মনসাদেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিরোধ প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানকে কেন্দ্র করে নাটকটির কাহিনীবৃত্ত গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গলের সুপরিচিত কাহিনীকে নাট্যকার এই নাটকে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেন। তাই তিনি পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে প্রচলিত পৌরাণিক ভক্তিরসের পরিবর্তে আধুনিক বাস্তব জীবনবোধ, মনন ও সংস্কারমুক্ত যুক্তি তুলে ধরেছেন। দেবী মনসার মর্ত্যে পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের বিরোধ সংঘটিত হয়। এর ফলে চাঁদ সদাগরের জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় এসে উপস্থিত হয়— মনসা কর্তৃক চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হৃত হয়েছে, ছয় পুত্র ও ধন্বন্তরি ওঝার মৃত্যু, তাঁর বাণিজ্যতরী কালিদহের জল তলিয়ে যাওয়া লক্ষ্মীন্দরের লৌহবাসরে সর্পদংশনে মৃত্যু, গাঙুড়ের জলে পুত্রবধূ বেহুলা তার মৃত স্বামী লক্ষ্মীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে স্বর্গে গিয়ে অনমনীয় তপস্যার মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্টকরে মৃতস্বামীর জীবন দান প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়েও চাঁদ সদাগর অটল থাকলেন। এমনকি চাঁদের আকস্মিক দৃঢ়তাকে কোনভাবেই আন্দোলিত করা যায়নি। অর্থাৎ মনসার কাছে তিনি মাথা নত করেননি। তাই দেব বিদ্বেষী চাঁদ সদাগরের বজ্র কঠোর অমিতবীর্য, অকল্পিত সাহস সকলে অনেককে উদ্বেলিত করে। তবে কাহিনীর পরিণতিতে দেখা যায় চাঁদ সদাগর শিবের আদেশে বাম হস্তে দেবী মনসার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। অর্থাৎ দৈবশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। মোটকথা, এ নাটকে মনসা ও চাঁদ সদাগরের সংঘর্ষ নিয়ে গড়ে ওঠা পৌরাণিক কাহিনীর

আড়ালে নাট্যকার বৃহত্তর শক্তির দ্বন্দ্বের পরবর্তীরূপ শাসকের সঙ্গে শোষিতের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে উপস্থাপিত করেছেন।

মন্মথ রায়ের পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট একটি পৌরাণিক নাটক। দৃশ্য বিভাগ গুলি অঙ্কের অন্তর্গত। 'কারাগার' নাটকটি ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে রচিত হলেও প্রবোধচন্দ্র গুপ্তের উদ্যোগে অভিনীত হবে বলে নাটকটি ঐ বছরেই ২৫ শে নভেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে পুনরায় নতুনভাবে লেখা হয়। মনোহর থিয়েটারে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩০ খ্রী: 'কারাগার' নাটকটির প্রথম রজনী অভিনয় হয়।

'কারাগার' পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও এই নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার তুলে ধরেছেন সমকালীন সময়ের ছবি। নাটকে দেখা যায় ভোজ বংশের নৃপতি উগ্রসেন যাদব বংশের রাজাকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করেন। উগ্রসেনের পুত্র কংসের নিষ্ঠুর, নির্মম অত্যাচারের জর্জরিত হয়ে একদল ভয়ার্ত যাদব আশ্রয় চায় যাদব প্রধান বাসুদেবের কাছে। কংসের পিতা উগ্রসেন কংসের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিবরণ শুনে ভীষণ মর্মাহত হন। কংস পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে নারায়ণ মূর্তি সরিয়ে মন্দিরে নিজের মূর্তি স্থাপন করার জন্য বিদূরথকে আদেশ করে। কিন্তু বসুদেব ও যাদব গণ বিদরথের এই কাজে বাঁধা প্রদান করে এবং শেষপর্যন্ত তাঁদের নৈতিক শক্তির কাছে সশস্ত্র বিদূরথ পরাজিত হয়। বিদূরথ পুত্র কঙ্কন ও কংসের অধীনে কাজ করে, সে ভালোবাসে কঙ্কাকে। কিন্তু কঙ্কা জানিয়ে দেয় সে কংসের দাসত্ব মুক্ত কঙ্কনকে গ্রহণ করবে। কংসের কারাগারে বিদূরথের স্ত্রী, পুত্র, বন্দী। কঙ্কন ও কঙ্কার উপর কংস নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। বসুদেব ও দৈবকীর শেষ সন্তানকেও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে কংস। অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত মানবের আকুল প্রার্থনায় অসহায় অধর্ম প্লাবিত পৃথিবীতে ধর্ম স্থাপনের জন্য, শোষণ পীড়ন বন্ধ করার জন্য অবশেষে দানব কংসের কারাগারে পরিত্রাতা ভগবান জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এর আড়ালে নাটকটি আরো একটি আন্তর্নিহিত অর্থ আছে সেটি হল— নাটকে যে কংসের কারাগার দেখানো হয়েছে তা কংসের নয় তা ছিল অত্যাচারিত ব্রিটিশের কারাগার। এখানে কংস সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির প্রতিরূপ। কঙ্কন এবং কঙ্কা অত্যাচারিত, শোষিত নিপীড়িত সংগ্রামী শক্তির প্রতীক। আর যদু বংশীয় মানুষের যেন অসহায়, পরাধীন ভারতের প্রজা তাদের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি শোষণ পীড়ন করে চলেছে।

''কারাগার' পৌরাণিক নাটক রূপে আখ্যায়িত হলেও এটিকে রূপক নাটকও বলা যেতে পারে। অত্যাচারী কংসের কারাগার ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কারগার, পরাধীন জাতির কারাগার। অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর প্রতি এইরূপ জাতিয়তাবাদী মনোভাব ইংরেজরা ভালোভাবে নেয়নি। তাই ১৯৩১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি নাটকটি বাজেয়াপ্ত করা হল— Whereas it appears to the

Governor-in-council that the play entitled 'Karagari' by Manmatha Ray, M.A. Printed by him at the Sree Gouranga press at no 71/1, Mirzapur street, Calcutta, and published at Barada Bhaban, Balurghat (Dinajpur), which has been performed at Monomohan Theatre, Calcutta, is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India. Now therefore, in exercise of the powers conferred by section & of the Dramatic performances fet, 1876 (XII of 1876), the Governor-in-Council hereby prohisbits the performance of the said play in any public place." (The Government of Bengal, political Department, Political Branch, No-1695P)

'ধর্মঘট' নাটকটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ-রাজনৈতিক নাটক। এটি চার দৃশ্যের নাটক। 'মন্মথ রায়ের গন্থাবলী'তে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক বসুমতী সহিত্য মন্দির (বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড), ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-১২, প্রকাশকাল, আশ্বিন, ১৩৭৯।

নাটকটির প্রধান চরিত্র কোম্পানীর চেয়ারম্যান— দীনবন্ধু চৌধুরী, প্রধান পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে বর্তমান শ্রমিক সংঘের সর্দার জনার্দন দত্ত এবং মহম্মদ ইব্রাহিম। অপ্রধান চরিত্র হিসাবে লোহারাম দাস, সুমঙ্গল সেন, লালমিঞা, হারান দাস, মায়া, পার্বতী প্রভৃতি বর্তমান।

নাটকটির বিষয়বস্তু রাজছত্র লিমিটেডত্র নামে ছাতা ও ওয়াটার প্রুফেসর কারখানা। চেয়ার ম্যাপ দীনবন্ধু মিটিং-এ প্রস্তাব দিলেন শ্রমিকদের কিছু বেশী ঘন্টা কাজ করতে হবে, আর না হয় তাদের ছাটাই মেনে নিতে হবে। এই ছাটাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র জনার্দন দত্ত এবং মহম্মদ ইব্রহিম ধর্মঘটের হুশিয়ারি দেয়। এরপর মহুয়া নাটক অভিনীত হয়। মহুয়া ও নদের চাঁদের ভূমিকায় মায়া ও লালমিয়া। সর্দার জনার্দন দত্তের মেয়ে মায়ার সঙ্গে শ্রমিক সর্দার মহম্মদ ইব্রাহিমের ছেলে লাল মিঞার প্রেমের সম্পর্কটি ফ্যাক্টরি ম্যানেজার লোহারাম দাসের কাছ থেকে চেয়ারম্যান শুনতে পান। এরপর চেয়ারম্যান হারান দাসকে দিয়ে মায়াকে অপহরণ করান। হারান দাস শ্রমিক সর্দার জনার্দনের মধ্যে জাতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় জাতপাতের সংঘর্ষ বাধে। বহু হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকের বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। হঠাৎ করে খবর হল মায়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। লালমিঞাই তাকে অপহরণ করেছে। আর এই সন্দেহ সকলের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করে। হারানের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হল। ইব্রাহিমের ঘরে আগুন ধরে যায়। তারপর উত্তেজিত জনতার সম্মুখে সত্য প্রকাশ পায়। লালমিঞার কোন দোষ নেই। মায়াকে দীনবন্ধুই নিজের গাড়িতে হারানের বাড়ি পাঠিয়ে

দেয়। এরপর আগুনলাগা ঘর থেকে মায়ার পুড়ে যাওয়া দেহ বের করা হয়। এবং পরিশেষে শ্রমিকরা ঐকসূত্রে আবদ্ধ হয়, শ্রমিকের ঐক্যে ধর্মঘট প্রতিষ্ঠিত হয়।

'পথেবিপথে' সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক অঙ্কের সংখ্যা তিন। দৃশ্য বিভাগ অঙ্কের অন্তর্গত। প্রথম অঙ্কে ১১টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে ৬টি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে ২টি দৃশ্য আছে। প্রকাশক বসমতী সাহিত্য মন্দির, প্রকাশকাল-প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৭৯।

নাটকটিতে মোট চরিত্র সংখ্যা হল ২১ টি। প্রধান চরিত্র হল— ভানু চৌধুরী, পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকায় ত্রিকাল বোস, তিনকড়ি, আবিনাশ, সুনন্দা প্রজাপতি সাত ভট্টাচার্য, মহিম, মায়া, ছবি, মানদা প্রভৃতি। এছাড়াও রেস্তেরার ম্যানেজার, হেডবয়, দুটি ছাত্র, দুইজন ব্যবসায়ী, প্রজাপতি অফিসের প্রজাপতি সাত ভট্টাচার্য, কৈলাস, বিপিন আরো অনেকে। সামাজিক মানুষের সুস্থ জীবনের বৃত্তায়নে চলার পথ চিরাচরিত, আকার ধিকৃত জীবনকে নিয়ে সুস্থ সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের চলার পথ, যা প্রচলিত মানবিক বিশ্বাস সাপেক্ষে বিপথ বলে চিহ্নিত— এই পথ এবং বিপথের মনস্তাত্ত্বিক রূপটি দর্শকের কাছে পৌঁছে দিয়ে প্রচলিত পথের উৎকর্ষকে ফুটিয়ে তোলাই আলোচ্য নাটকের মুখ্য উপজীব্য। নাটকের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজের ভেঙ্গে পড়া মনুষত্বের অবলুপ্তির নানা চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। নাটকের মূল চরিত্র ভানু চৌধুরী একজন নৃশংস, ভণ্ড প্রতারক ব্যক্তি। সে স্বাগতা রেস্তেঁরায় খেয়েছে কিন্তু টাকা দেবার কোন ক্ষমতা নেই। মহিম রায়কে মিথ্যার পর মিথ্যা কথা বলে তার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এরপর মহিমের মেয়ে রমার সঙ্গে ভানুর বিয়ে হয়। রমাকে নানারকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলকাতার বাইরে একটি পুরাতন বাড়িতে নিয়ে এসেছে। কলেজ কমিটির প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি পড়ে ভানুর সুন্দরী স্ত্রীর উপর। তার স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়। নানা ধরনের সামাজিক আঘাতে সে শয়তান হয়ে ওঠে। এরপর 'আনন্দম' ক্লাবের সঙ্গে ঘটনাচক্রে ভানুর পরিচয় হয়। ক্লাবে সে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে এবং ঐ ক্লাবের সুন্দরী নর্তকী সুনন্দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এখানেই নাটকের মূল চরিত্র ভানু চৌধুরীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়— পথের সঙ্গে বিপথের সংঘাত। সে রমাকে খুন করবে বলে মনস্থির করে এবং ভাঙা নির্জন বাড়িতে অসুস্থ রমাকে ভয় দেখিয়ে মেরে ফলে এবং ইনশিয়রেন্স এর দশ হাজার টাকা পায়। এরপর সে এক জমিদারবাড়ির বোবা মেয়ে ছায়াকে বিয়ে করে। ভানু বিপথে গিয়ে প্রথম পত্নীকে হত্যা করলেও দ্বিতীয় বোবা পত্নীকে সে 'আনন্দম' চক্রের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। আনন্দম-এর সদস্যরা ছায়াকে মেরে ফেলার জন্য চাপ দেয়। তারা ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলে ছায়াকে যদিও এই কাণ্ডের কাণ্ডারী ভানু, যার হাত ধরেই ছায়া বেরিয়ে এসেছিল। এরপর ভানু তার সুপ্ত প্রেমের সুনন্দাকে বিয়ে করে। ভানুর ভালবাসার ছোঁয়ায় বিপথের পথিক সুনন্দার মনেও উজ্জীবিত হয় নারীসত্তা—

''ওগো তুমি কেন এমন করলে? এমন করে নিজের হাতে নিজের সর্বনাশ করলে।'' অর্থের প্রতি মোহ— কণ্ঠরোধ করে মানুষের, কেড়ে নেয় সুখ ভালবাসা প্রেম স্নেহ, আনন্দ এই চিরসত্যটিকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন।

নাট্যকার শিব প্রসাদ করের লেখা অন্যতম নাটক হলো 'স্বর্ণলঙ্কা'। এটি একটি পৌরাণিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রকাশক আর. এইচ. শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা। প্রকাশনার কাল ১৯৪৫ খ্রি:। প্রথম অভিনয় 'নাট্যানিকেতন' কলকাতা, ৩০ শে শ্রাবণ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রি:)। এবং নাটকটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সগৌরবে অভিনীত হয়েছিল। এই সম্বন্ধে স্বয়ং নাট্যকারের কন্যা নীলা কর তাঁর 'কাছের মানুষ নট ও নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর' প্রবন্ধে জানিয়েছেন— '' 'স্বর্ণলঙ্কা' নাটকটির ভারতবর্ষের প্রায় সবখানেই সগৌরবে অভিনীত হয়েছিল, যেমন— সিম্‌লা, পেশোয়ার, দিল্লী, ধানবাদ, ঝরিয়া, মধুপুর, চট্টগ্রাম এবং কোলকাতা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে গ্রামে। কোলকাতায় আজকের 'স্টার' থিয়েটার হলে 'স্বর্ণলঙ্কা' নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয় এবং সেখানে সরযূবালা, নরেশ মিত্রের মতো স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্বরাও অভিনয় করে।''

নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর ছিলেন মন্মথ রায়ের অগ্রজ প্রতিম। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত দিনাজপুরের বালুরঘাটে এই 'স্বর্ণলঙ্কা' নাটকটি লেখা হয়। এই নাটকটির পরিচালক ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী এবং স্বয়ং নির্মলেন্দু লাহিড়ী আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাবণের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার শিপ্রসাদ কর নাটকটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন— ''অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বন্ধুবর-শ্রীমান্ মন্মথ রায়ের উৎসাহে— ১৯২৬ সালে বালুরঘাটে এই নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হই। তাহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আজ এত বৎসর পরে 'স্বর্ণলঙ্কা' পাদপ্রদীপের সম্মুখীন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। তাহাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার নাই। শ্রীমানের অমৃত লেখনী যুগ যুগ ধরিয়া বাংলার নাট্যরসিক সুধীবৃন্দকে আনন্দ দান করুন, ভগবানের নিকট ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রযোজক পরম শ্রদ্ধেয়— শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় রুগ্ন শয্যায় শায়িত থাকিয়াও 'স্বর্ণলঙ্কা'কে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন সে জন্য তাহাকে আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নাট্যজগতের অপরিচিতি আমি— পরিচয় দান করিয়া তিনি আমাকে আচ্ছেদ্য ঋণ পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। নাট্যনিকেতনের সুযোগ্য পরিচালক সহপাঠী সুপ্রিয় বান্ধব নটচূড়ামণি শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয় 'স্বর্ণলঙ্কা'কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। 'রাবণ' চরিত্রকে তিনি যে অপরূপ রূপ

মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শক্তিশালী নটের পক্ষেই সম্ভব। স্বর্ণলঙ্কার প্রধান ভূমিকায় তাঁহাকে পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"

'স্বর্ণলঙ্কা' নাটকটি পৌরাণিক শৈলীতে পাঁচটি অঙ্ক বিশিষ্ট পৌরাণিক পূর্ণাঙ্গ নাটক— ''নাটকং খ্যাতবৃত্তং পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম্।" তাই এ নাটকের কাহিনী পৌরাণিক রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কার কাহিনীবৃত্ত নিয়ে নাট্যঅবয়ব গড়ে উঠেছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র রাবণ। নাটকটির প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি, চতুর্থ অঙ্কে ছয়টি এবং পঞ্চম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য রয়েছে।

এই নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলি হল-ব্রহ্মা, সমুদ্র, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ মারীচ, নিকুরুম্ভ, মেঘনাদ, তরণী সেন, বালী, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ, প্রহরী, অনুচর, দূত, বাদ্যকারগণ, পুবাসীগণ এবং স্ত্রী চরিত্রগুলি হল-সীতা, জগন্মাতা, মন্দোদরী, সরমা, প্রমীলা, সূপনখা, তারা শবরী, রুমা প্রহরিণী, জল দেবীগণ, চেড়ীগন, অপ্সরাগণ, পুরবাসিগণ ইত্যাদি।

শ্রুতি মধুর গীত রয়েছে এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটিতে। সংগীতগুলি উন্নত সাহিত্য রসে পরিপূর্ণ। শব্দের সুরময় মাধুর্য এবং সুরের ছন্দ একটি সুমধুর তালময় পরিবেশ রচিত করেছে। নাটকটির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গীতের সার্বিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সাহিত্যরস মণ্ডিত হয়েছে। আর গীতের সঙ্গে নৃত্যের সুনিপুণ সংযুক্তিকরণে যে নাট্যকৃতি তৈরী হয়েছে, তা দর্শকদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। আলোচ্য নাটকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নাট্যকারের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়— ''স্বর্ণলঙ্কাকে সঙ্গীতসম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়েছেন সুকবি শিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী এবং তাঁহার রচিত গানগুলিকে সুর ঝঙ্কারে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, সুর-শিল্পী আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু 'হিজমাস্টার ভয়েসের' প্রফেসর বিমলগুপ্ত।... নৃত্যকলাবিশারদ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সুচারু নৃত্যপরিকল্পনায় 'স্বর্ণলঙ্কা'কে অপূর্ব সুষমায় ভূষিত করিয়াছেন। পরিশেষে নাট্যনিকেতনের সুনিপুন শিল্পীবৃন্দ যে ঐকান্তিকতার সহিত 'স্বর্ণলঙ্কাকে' সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা সকলেই আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

এই স্বর্ণলঙ্কা নাটক প্রসঙ্গে বিখ্যাত নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য নীলা করকে (সম্পর্কে নাট্যকারের কন্যা) উদ্দেশ্য করে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন— ''অবশ্য আমার মনে হয় তোমার বাবার একখানা নাটকই তাঁকে অমর করে রাখবে। তখনকার দিনে রামায়ণ চরিত্রের উপর ঐ রকম দুঃসাহিক নতুন চিন্তা— ভাবতেই ভয় করে।" ('কাছের মানুষ নট ও নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর', নীলা কর)

আলোচ্য নাটকটিতে ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সাক্ষাত লাভ করা সম্ভব— তা তুলে ধরাই

প্রধান উপজীব্য। এই নাটকের সংলাপগুলি কাব্যিক ছন্দে উপস্থাপিত হয়েছে। এবং কাব্যের আবেগে সংলাপগুলির ভাব পরিবেশিত হওয়ায় নাট্যক্রিয়া এবং ঘটনার আবর্ত ও পরিস্ফুটিত হয়েছে। বিষয়গত ভাব ভাষা গভীর হলেও মূলত ভক্তিরসে সিক্ত হয়ে ভক্তিরসই যেন এ নাটকের কাহিনীর মূলে গ্রথিত হয়েছে। এমনকি চরিত্রগুলির কাছে ভক্তিরস যেন উপাচার, তাদের মন্ত্র হল দেবতার প্রশস্তি বন্দনা এবং উদ্দেশ্য পৌরাণিক দেব-ভাবনামুখী হয়ে নাট্যকাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

'প্রতিষ্ঠা' শিব প্রসাদ করের লেখা দ্বিতীয় ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। স্বয়ং নাট্যকার নাটকটির প্রকাশক। প্রকাশনার স্থান— মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৪ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রকাশনার কাল উল্লিখিত হয়নি।

নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর নাটকটির 'উৎসর্গ' শীর্ষক অংশে উল্লেখ করেছেন— ''যাহারা আগ্রহে ও উৎসাহে 'প্রতিষ্ঠা'র জন্ম, জাতীয় ইতিহাসমূলক নাটক-সংকলন-ব্রতে আমার সেই প্রথম ও প্রধান উৎসাহদাতা শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিজা মোহন নিয়োগী মহাশয়ের করকমলে আমার অন্তর্নিহিত গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ 'প্রতিষ্ঠা' সাদরে অর্পিত হইল।''

এই নাটকি পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য ও পঞ্চম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য আছে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে শিবপ্রসাদ করের সগৌরবে অভিনয় জীবনের ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দিনাজপুর নাট্যসমিতি 'শিবপ্রসাদ সম্মান রজনী'র ব্যানারে এক মহোৎসব পালনের আয়োজন করে এবং এই সম্মান রজনীর নির্দ্ধারিত সভাপতি স্বনামধন্য নাট্যকার শ্রী মন্মথ রায় কলকাতা থেকে দিনাজপুরে এসে তিনি বলেন— ''এই উপমহাদেশের আসন্নপ্রচার স্বাধীনতা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে শিবপ্রসাদকে উদ্দেশ্য করে সভাপতি মহোদয় বলেন— ''এখন থেকে স্বাধীন দেশের উপযোগী নাটক রচনা ও উপযুক্ত মঞ্চায়নই নাট্যকার ও প্রযোজকদের দায়িত্ব হওয়া উচিত।'' তাই সভাপতির বক্তব্য থেকে শিবপ্রসাদ কর রচিত প্রতিষ্ঠা ও স্বর্ণলঙ্কা নামে নাটক দুটির কথা জানতে পারা যায় এবং নাটক দুটি প্রকৃত দেশাত্মবোধের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হয়েছিল।

আলোচ্য নাটকের পুরুষ চরিত্রের ভূমিকা রামপালদেব, রাজ্যপালদেব, কুমারপালদেব, রাজা সোম, শিবরাজ, ভীষ্ম, রাঘব সর্দার প্রভৃতি। এবং নারী চরিত্রের ভূমিকায় রমা, লক্ষ্মী, তারা, রুক্মা, এবং ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে বাংলা পাল বংশোদ্ভূত বংশধরগণ রামপালদেব, কুমারপালদেব, পূর্বন্ধানাধিপতি রাজা সোম, রাষ্ট্রকুট অধিপতি শিবরাজ, কৈবর্ত্তের অধিপতি ভীম, রাঘব সর্দার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'প্রতিষ্ঠা' নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে বাংলার পালবংশের রাজা রামপালদেব, কুমার

পালদেব, পূবন্ধাধিপতি রাজ। সোম; রাষ্ট্রকুট অধিপতি শিবরাজ কৈবর্ত্তের অধিপতি ভীম, রাঘব সর্দার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই নাটকটির কাহিনী ধারার মধ্যে কিছুটা হলেও ইতিহাসসম্মত ভাবনা প্রতিভাত হয়েছে গৌড়বঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজবংশ পালরাজাদের শাসন অধিকার করে এবং গৌড়বঙ্গের সম্রাট হন কৈবর্ত অধিপতি ভীম। পরবর্তীকালে রাজ্যচ্যুত বঙ্গ সম্রাট দ্বিতীয় মহীপাল দেবের ভাই রামপালদেব সামন্ত রাজাদের সহযোগিতায় ভীমকে পরাজিত করে হৃত রাজ্য উদ্ধার করেন। দ্বিতীয় মহীপালের রাজ্বকাল ছিল সংকটপূর্ণ এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছিল তাই তিনি তার দুই ভাই শূরপাল ও রামপালকে বন্দী করেন। মহীপালের ধারণা হয় রামপাল তার সিংহাসন অধিকার করে নেবে। তবুও মহীপাল আত্মরক্ষা করতে পারেননি কারণ অল্পকালের মধ্যেই তাকে সুসংহত সামন্তবর্গের সুসংহত বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই বিদ্রোহে তার রাজত্ব হারিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিহাসের এই কাহিনীর উপাদান অবলম্বন করে নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর তার প্রতিষ্ঠা নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকের কাহিনীর শুরুতে রামপালদেব কি করে সিংহাসনের লোভে বশবর্তী হয়ে অগ্রজ দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে স্বার্থের প্ররোচনায়, নির্বুদ্ধিতায়, পরশ্রীকাতরতায় অনার্য্য কৈবর্ত্তেদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি মহাপাপ করেছেন এবং সেই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে ইচ্ছুক এবং এই বিষয়ে তার স্ত্রী রমাদেবী যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে বলেন যে, স্বামী তুমি কোন দুঃখ, হতাশা না করে বৃথা আত্মগ্লানিতে নিজেকে ছোট করো না। কারণ পাপের তীব্র বিষাক্ত নিশ্বাস অনুতাপের আগুনে পুড়ে নির্মল হয়ে গেছে। তাই রমাদেবী স্বামীকে রামপাল দেবকে তাদের যে কৃতিসন্তানগণ আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত রাজন্যবর্গের প্রাণে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঞ্চার করেছে, তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন তোমায় অবহেলায় মাতৃভূমি অনার্য করতলগত হয়েছে এবং উপযুক্ত সন্তান তুমি। তাই মাকে দস্যুর হাত থেকে মুক্ত করে আন এবং অনার্য কৈবর্তকে বঙ্গদেশ কে দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দেখিয়ে দাও দ্বিতীয় মহীপালদেবের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রীয়তীর্থ নিতে যায়নি। এরপরেও রামপাল নিজেকে রাজ্যহীন, সহায়হীন ও সম্বল হীন মনে করে কৈবর্তদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন কিভাবে— এই ভেবে দুর্বল হয়ে পড়েন তখন রমাদেবী পুনরায় তাকে উৎপাদিত করেছেন এই বলে যে, ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ দেবপাল পালবংশকে বঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই বংশের বংশধর হয়ে তোমার মুখে দুর্বলতার শোভা পায় না। এবার সর্বশক্তি দিয়ে তুমি কৈবর্তদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলেন। এরপর রামপালদেব নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে দুর্বল না ভেবে শক্ত চিত্তে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। তখন রামপালদেব তার পুত্রদ্বয় রাজলপাল ও কুমারপালকে ভীমরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। এরপর রামপালদেব

সামন্তরাজা শিবরাজ, রাজা সোম, কাহ্নুরদেব প্রভৃতি রাজাদের সহযোগিতায় ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করে জয়লাভ করে ভীমকে বন্দী করেন এবং রামপালদেব শেষপর্যন্ত তাঁর মাতৃভূমি তথা জন্মভূমি পুনরুদ্ধার করে পালবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

'আজব বিচার' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার বিশিষ্ট নাট্যকার পরেশ ঘোষের 'আজব বিচার' নাটকটি একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রকাশনায় শ্রীমতি মীরা ঘোষ, ৫৯, দিঘির পাড় রোড, কলিকাতা-৪৮। প্রকাশনার চারটি দৃশে রচিত। দৃশ্যগুলি পরস্পর সম্পর্কে যুক্ত এবং ঘটনাগুলি পারস্পরিক কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত।

নাটকটি মি নার্ভা থিয়েটারে রজনী ১৮ অক্টোবর, ১৯৬৭ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বরূপা, মুক্ত অঙ্গন, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চগুলিতেও পরিবেশিত হয়। নাট্যকার স্বয়ং 'আজব বিচার' নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন এবং 'বটুকেশ্বর' চরিত্র ভূমিকায় তিনি নিজে অভিনয় করেন। এছাড়াও অজিত ভট্টাচার্য, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হালদার, রাসবিহারী দে, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন ভট্টাচার্য কমলা মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট নটকুশলীগণ এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নাটকটির প্রযোজক সংস্থা হিসেবে রূপচক্র, রঙ্গতীর্থ, মধুচক্র উল্লেখযোগ্য। 'আজব বিচার' নাটকে প্রধান পুরুষ চরিত্র হল— বটুকেশ্বর, প্রধা প্রধান স্ত্রী চরিত্র মল্লিকা, অপ্রধান চরিত্রগুলি মি: রায়, মি: পাল, সহকারী চরিত্রগুলি হল— জগমোহন, মি: দত্ত, মেজর সান্যাল, পুলিশ ইন্সপেক্টর, বিবেক সারথী, বিচারক, পরিমল রায়, রামখেলান, কুন্তলা, বনলতা প্রভৃতি।

নাটকটির কাহিনী, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ চন্দ্রাবতী দেবীর খুনের ঘটনা নিয়ে আবর্তিত হয়। নাটকটি কাহিনী প্রধান না হয়ে ঘটনা প্রধান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রধান হয়ে উঠেছে। ক্যাপ্টেন রায়ের সঙ্গে নার্স মল্লিকার পরিচয় ঘটে যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে। সেই পরিচয় থেকে প্রেম এবং শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আবদ্ধ হন এবং তাদের সামরিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সংসার জীবনে প্রবেশের আগে সামরিক জীবনের অতীত কিছু বিশেষব্যক্তি মল্লিকার ছিল। মেজর সান্যালের মতো মহাপ্রাণ ডাক্তার, ডেভিন্তের মতো ছোট ভাই এবং বিবেক 'সারথীর' মতো বন্ধু। সংসার জীবনে প্রবেশের পর মি: রায়ের সঙ্গে কোন এক চন্দ্রবতীর পরিচয় ঘটে। চন্দ্রাবতী হঠাৎ একরাতে খুন হয়। মি: রায় গ্রেপ্তার হন খুনী সন্দেহে। এরপর মল্লিকা স্বামী কর্তৃক তার বিচারের কাঠগড়ায় খুনী হিসেবে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু চতুর ব্যারিস্টার বটুকেশ্বরের কৌসুলীপনায় মল্লিকার সাক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং মি. রায় বেকসুর মুক্তি পান। এরপর ঘটনাটি হঠাৎ করে অন্য দিকে মোড় নেয়। মি: রায় কুন্তলা নামে অন্য এক যুবতীকে বিবাহ করতে প্রস্তুত এই সময় মল্লিকা মি. রায়কে ঘর না ভাঙতে অনুরোধ করে এবং স্বামী কোনো মতে রাজি না হওয়ায় মল্লিকা

বাধা হয়ে মি: রায়কে খুন করে। মল্লিকার অসহায় অবস্থা ব্যারিস্টার বটুকেশ্বর বুঝতে পেরে মল্লিকার হয়ে এবার কৌশলীপনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। নাটকটি এখানে শেষ হয়।

'মানবী ও মুদ্রা'- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যকার পরেশ ঘোষের 'মানবী ও মুদ্রা' একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকটির প্রকাশ কাল ১৫ আগস্ট, ১৯৭৪ খ্রি: প্রকাশনায় মীরা ঘোষ। এই নাটকটির প্রথম প্রযোজক সংস্থা নবারুণ নাট্যসমাজ-কুশমণ্ডি, পশ্চিম দিনাজপুর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রযোজক সংস্থা যথাক্রমে শিলায়ন ও রসতীর্থ। নাটকটির নির্দেশনায় প্রথম দিকে ছিলেন বিনয় মালাকার, পরের দিকে স্বয়ং নাট্যকার পরেশ ঘোষ। এই নাটকটি চারটি দৃশ্য অবলম্বনে রচিত। দৃশ্যগুলি কেন্দ্রীয় ঘটনাকে কেন্দ্রকরে আবর্তিত হয়েছে।

আলোচ্য নাটকটির বিষয়বস্তু হল প্রেমভালোবাসা কখনই অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় না। অর্থ কখনই প্রেমের রসদ হতে পারে না। নাট্যকার শুরুতেই বলেছেন— ''প্রেম শিল্পরসে সিক্ত, সে বারবার প্রয়োজনের বাঁধন কেটে ছুট দেয়, অরণ্যে আকাশে সমুদ্র প্রান্তরে...'' এইভাবেই বেড়ে যায় দুজনের দূরত্ব আর এক সময় অস্পষ্ট হয়ে আসে পরিচয়ের স্মৃতি। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অঞ্জনা। সে বারবার প্রকৃত প্রেমকে খুঁজেছে কিন্তু পায়নি, হয়েছে শুধু অর্থের কাছে ধর্ষিতা। ভোম্বোল আর স্বামী সুদখোর তেজেন্দ্র তার শরীরকে শুধু উপভোগ করেছে। সঞ্জয়, কাজল, রবি, অঞ্জনার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছে শুধু কিন্তু অঞ্জনা তাদের মধ্যে নিরাপত্তা খুঁজে পায়নি। অঞ্জনা রবিকে কিছুটা হলেও বিশ্বাস করতে পেরেছিল কিন্তু রবি এই রকম হতভাগ্য মেয়ের সাথে আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়নি। সবশেষে অঞ্জনা তার নিষ্ঠুর অত্যাচারী সুদখোর স্বামী তেজেন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেও তার প্রেমে আর সাড়া দেয়নি। এরপর জীবনের চরম ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে অঞ্জনা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

'ভাঙ্গাপট' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার কৃতিসন্তান নীহার ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন জার্মানে বাস করার সুবাদে জার্মান ভাষারপ্ত করে জার্মান নাটক বাংলায় অনুবাদ করে লেখা শুরু করেন। তারই অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ভাঙ্গাপট। জার্মান নাট্যকার Heinrich von Kleist-এর 'Der Zerbrochene Krug' নাটক বাংলা ভাষায় 'ভাঙ্গাপট' নামে নাট্যরূপ দিয়েছেন নীহার ভট্টাচার্য। 'অনন্য প্রকাশ, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ-২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২।

আলোচন্য নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার নীহার ভট্টাচার্য বলেছেন— ''ভাঙ্গাপট' 'কাইষ্ট'-এর 'Der Zerbrochene Krug' অবলম্বনে রচিত। মূল জার্মান নাটকের যাবতীয় রস বজায় রেখে তার বাংলা রূপ। এ যেন বাঙালী হেসেলে প্রস্তুত জার্মান খাদ্য। ক্ষুধা একটি আন্তর্জাতিক অনুভূতি এবং খাদ্য তার উপশমের উপায়। তৃপ্তি আশা করছি। তবে প্রকৃত রায় দেবার অধিকার খাদ্য

গ্রহণকারীর। তার তৃপ্তিতে প্রস্তুতকারক তৃপ্ত। বাংলার যে কোন গ্রামের পটভূমিকায় এ নাটক মঞ্চস্থ করা যায়।"

৭টি দৃশ্য সংখ্যা নিয়ে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। একটি ভাঙ্গাপটকে অবলম্বন করে দৃশ্যগুলি কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত।

আলোচ্য নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র-মনু। প্রধান পার্শ্বচরিত্র রূপা। মনু একজন গ্রাম্য মোড়ল। মোটচরিত্র সংখ্যা ১১টি— মনু, আলো, আরদালী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর মা, এন্ডিও, মতির মা, ইতু, রূপা, চৈতী, ভোলা প্রভৃতি। এখানে মনু চরিত্রটি 'রক্ষকই ভক্ষক' হয়ে উঠেছে।

গ্রাম্য মোড়ল মনু গ্রামের মানুষের মাথা। মোড়ল সকলে বিচার করেন এবং সেই মতো শাস্তির বিধান হয়। কিন্তু মোড়লের পাপ পূণ্যের বিচার করার কেউ থাকে না। বিচারের বিষয় ভাঙ্গাপট। বাদী মতির মা চরিত্রটি বা এবং আসামী রূপা। মতির মা তার মেয়ে ইতুর সঙ্গে গ্রাম্য যুবক রূপার বিয়ের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে রেখেছে। তবে সম্পর্ক নির্দিষ্ট হওয়ার আগে থেকেই ইতুর সঙ্গে রূপার সম্পর্ক ছিল। এবং সেই কারণে রূপা ইতুর ঘরে যাতায়াত করত। অপর দিকে ইতুকে ছল করে গ্রাম্য মোড়ল মনু নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসত। রাতের অন্ধকারে ইতুর ঘরে গিয়ে নানা প্রলোভন দেখাত। মোড়ল তার অপরাধ যত চাপা দিতে চেষ্টা করেছে, ততই তার অপরাধটা প্রকট হয়ে পড়েছে। মোড়ল এবং ইতু দুটি চরিত্রই সত্যকে চাপা দিতে চায়। ইতু চায় নিজের প্রেমিকাকে আর মোড়ল চায় নিজেকে বাঁচাতে। অন্যদিকে মাস্টার চায় মোড়ল হতে আর সরকারী আমলা চায় সত্য প্রকাশ করতে। মতির মা জানে তার ষোল বছর বয়সের জীবন থেকে যে মাটির পটটি তার কাছে, তা রাতের আঁধারে ইতুর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে আসা রূপা ভেঙ্গেছে। এই নিয়ে রূপার সঙ্গে বচসা হয়। মেয়ে ইতু ও মোড়লের ভয়ে কিছু বলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মোড়লের প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেন এস.ডি.ও। মোড়ল সভা ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করলে গ্রাম্য শিক্ষক আলো মোড়লকে ধরে। রূপা ইতুর সম্পর্কে যে গালমন্দ করে তার জন্য অনুশোচনার মাধ্যমে ক্ষমা চায়। রূপা ইতুর বিয়ের দিন স্থির করে মতির মা।

'রাস্তা' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিশিষ্ট নাট্যকার নীহার ভট্টাচার্যের 'রাস্তা' নাটকটি একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রকাশক নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ, নাটক সংস্কৃতি সংবাদ ত্রৈমাসিক, বিশেষ সংখ্যা—১, বালুর ঘাট। প্রকাশনার কাল ১৯৯০ খ্রী:।

চারটি প্রলম্বিত দৃশ্য নিয়ে নাটকটির নাট্যঅবয়ব সংগঠিত, কোন অঙ্ক বিভাজন নেই। দৃশ্যগুলি কেন্দ্রীয় ঘটনার পরিপূরক এবং ঘটনার সূত্র সুবিন্যস্ত। তবে নাটকে দেখা যায় নাটকটির সুসংহতি পরিণতি নেই। নাটকটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠেনি। চরিত্রগুলিও অন্ধকারাচ্ছন্ন, অর্ধস্ফুট। কাহিনী

খুবই সংক্ষিপ্ত। নাটকটির মূল উপজীব্য শ্রমিক শ্রেণী চিরকাল অবমাননার শিকার। তাই মালিক শ্রেণী দ্বারা শ্রমিক শ্রেণী সর্বকালে বঞ্চিত, শোষিত হয়ে আসছে। শ্রমিকের সুখ-আনন্দ সবকিছুই মালিকের নিকট লাঞ্ছিত ও পদদলিত। শুধুমাত্র মালিকের বাড়িতে শ্রম দেওয়ার জন্যই যেন শ্রমিকের জন্ম। শুধু শ্রম না শ্রমিকরা মালিকের ভোগ লালসার বস্তু হয়ে ওঠে। মালিক শ্রেণী এগুলিকে নিজে প্রাপ্য বলে মনে করে। শ্রমিক নিজের জীবন বিপন্ন করে শ্রমদান করে অথচ মালিক কোন শ্রম দেখতে পায় না, শ্রমের কোন মর্যাদা নেই মালিক শ্রেণীর নিকট— এই রূঢ় বাস্তব সত্যটি এ নাটকে প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হল রঘুপতি। অন্যান্য চরিত্রগুলি হল— মদন, মাধো, কাঞ্ছী, হারু, মদন, মতি, ইঞ্জিনিয়ার, মালিক। প্রধান পার্শ্বচরিত্র হল মদন ও কাঞ্ছী।

নাটকটির কাহিনীতে আছে— শ্রমিকের একটি অস্থায়ি আস্থানা গড়ে উঠেছে একটি পাহাড়ি রাস্তাকে তৈরি করার জন্য। সেখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন কাজটি সুষ্ঠভাবে দেখভালের জন্য এবং কাজটি শেষ বারের জন্য। খারাপ আবহাওয়ায় প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে দুইজন শ্রমিক খাদে পড়ে যান এবং তারা মারা যান। ইঞ্জিনিয়ার ছোড়াগুলিতে মদনও আহত হয়। অন্যদিকে মালিক কামনায় বিভোর হয়ে রয়েছে। মালিক মহিলা শ্রমিক কাঞ্ছিকে উপভোগের তাড়নায় ছটফট করছেন। এই রকম অবস্থায় দুইজন শ্রমিক কাদামাখা অবস্থায় এসে মালিককে খবর দেয় দুইজন শ্রমিক পাহাড়ের খাদে পড়ে মারা গেছে। মালিক দেখতে পাচ্ছে দুই জন শ্রমিক আর ইঞ্জিনিয়ার আসছে এদিকে। সে নিজের আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে। রঘুনাথ মালিকের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বলে— ''চুপ করে বসে থাকুন। পুলিশ আসুক।''

এই নাট্যকারের অন্যান্য নাটকগুলি: 'গ্যালিলেও' (অনূদিত নাটক), 'তিন বিজ্ঞানী' (অনূদিত নাটক), 'মঙ্গলা চরণের বিবাহ' (অনূদিত নাটক)।

'ভোর'— নাট্যকার নির্মলেন্দু তালুকদারের লেখা একটি সামাজিক একাঙ্ক নাটক। নাটকটির প্রকাশনায় নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ পত্রিকা একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, প্রকাশনার কাল-২০০১ খ্রি:।

ভারতবর্ষে জাতপাত তথা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে ধর্মীয় বিষয়টি এক ভয়াবহরূপে প্রকটিত হয়। তার ফলে এক শ্রেণীর প্রাচীন পন্থী মানুষকে তাদের কূপমণ্ডুক বিশ্বাস থেকে টলানো যায় না, আবার ঠিক তার বিপরীতে রয়েছে আধুনিক উদার মনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল নবপ্রজন্মের তরুণ সম্প্রদায়, যারা সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শার্শ্বত মানবিক মূল্যবোধের প্রকৃত ধারক ও বাহক— তারই এক বাস্তব নিদর্শন এই নাটকে উদ্ভাসিত হয়েছে।

নাটকটির বিষয়বস্তু হল অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক আচার্য হরিমাধব শাস্ত্রী বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে সনাতন হিন্দধর্মের মূলতত্ত্বের উপর একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রধান বক্তা রূপে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমন্ত্রণ জানায়। তিনি এই আমন্ত্রণে সম্মতি জানিয়ে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ায় তাঁর ছেলে প্রকাভর বাবাকে সেখানে বক্তব্য দিতে যেতে নিষেধ করেন। বিশেষ করে সে বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে সময়টাকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ কয়েক মাস আগেই কাশীতে একটা সামান্য কারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি কুৎসিৎ ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। এবং সেখানে বাবার বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা বজায় না থাকলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে পারে। এবং পুত্রবধূ চন্দ্রার বাবাও নিষেধ করে তিনি বক্তব্য প্রদানে বেনারসে গমন করেন এবং বক্তব্য পরিসমাপ্তে খবর পান তার ছেলে অসুস্থ, তাই তিনি অতিসত্ত্বর সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে এসে হাসপাতালে ছেলেকে দেখতে যান এবং জানতে পারেন প্রতিবেশী মৌলানা আমিনুদ্দীনের সহযোগিতায় ও ছেলে রহিমের রক্তদানের ফলে তার ছেলে সুস্থ হয়ে ওঠে— এই সংকটজনক মুহূর্তে হরিনাথ শাস্ত্রী উপলব্ধি করলেন যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে এক রক্তই প্রবাহিত। এই বোধ থেকেই শেষপর্যন্ত তিনি তার প্রতিবেশী মৌলানা আলিমুদ্দীনকে উষ্ণ আলিঙ্গন করে তার এতদিনের সযত্ন লালিত সাম্প্রদায়িক ভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে সম্প্রদায় সম্প্রীতির চিরন্তন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন— এখানে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ সহ বৃহৎবঙ্গের খ্যাতনামা ও স্বনামধন্য নাট্যকার। তিনি অন্যতম প্রথিতযশা লেখক-নাট্যকার ও নির্দেশকই নন। সেই সঙ্গে তিনি একজন প্রতিভাবান সুদক্ষ অভিনেতা, নাট্যস্রস্টা, নাট্যসংগঠক। তিনি সংস্থার স্বার্থেই নাট্যসৃজন পর্বে প্রবেশ করেন। তাঁর লেখা নাটকের সংখ্যা পঞ্চাশেরও উর্দ্ধে, যা উত্তরবঙ্গসহ সারাবাংলার বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে এবং তাঁর রচিত কিছু কিছু নাটক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। আমি আলোচ্য পরিসরে তাঁর নাট্যকৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি নাটক আলোচনায় প্রয়াসী।

'দেবাংশী' দক্ষিণ দিনাজপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা ও প্রথিত যশা নট-নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় গল্পকার অভিজিৎ সেনের গল্প অবলম্বনে 'দেবাংশী' নাট্যরূপ দিয়েছেন। যা সমগ্র উত্তরবঙ্গ সহ সারা বাংলা জুড়ে প্রশংশিত হয়েছিল। নাটকটি প্রবোধবন্ধু অধিকারী সম্পাদিত জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'এই দশকের সেরা নাটক' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার কাল ১৪ ই এপ্রিল, ১৯৮৬ খ্রী:।

নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৮৩ সালে ১৩ই নভেম্বর, গোবিন্দ অঙ্গন বালুর। ত্রিতীর্থ প্রযোজিত। নির্দেশক স্বয়ং নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। আলোচ্য নাটকটি ১৭টি দশ্যরূপ নিয়ে সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকে অঙ্ক বিভাজন নেই। কেন্দ্রীয় চরিত্র সারবান এবং প্রতিনায়ক চরিত্র

দেবেন মণ্ডল, বিনোদ। পার্শ্বচরিত্র: সামসের, বিমান, সেতু গিদন, নগনা, চৈতা, বনমালী, রঘু, সুখন, গোষ্ঠ, বৈজা, জগদীশ, জাফর, অনাথ, রুহিনা, মোক্ষদা, পঞ্চদা, কৌশল্যা, সুশীলা, জেবনের বৌ প্রভৃতি। সহায়ক চরিত্র— সামসেরের চেলা, বিরামের চেলা, সুখেনের ছেলে, বৃদ্ধ গ্রামবাসী বৃদ্ধাগণ, গ্রাম্য মহিলা, গ্রামবাসী প্রভৃতি।

নাটকটি মূল বিষয়বস্তু হল— কুসংস্কারের বশে মানুষ মানুষের দ্বারাই দেবাংশী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দেবত্ব ও মানবিকত্ব এই দুইয়ের টানাপোড়েনে দেবাংশী কতখানি অসহায় করুন মানবিকতার শিকার হয়— তাই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সারবানের বক্তব্যে শোনা যায়— ''আইজ মোর কথা কবার দিন আসছে। মোর কথা আপনাহের শুইনবা হোবে। এই তিরিশ বছর ধইরে দেবতার থানে আপনেরা মোক ভক্তি করিছেন। পূজা দিছেন। মুই সিলা নিছি। মুই মহাপাপ করিছি। সি পূজায় মোর অধিকার নাই, তাই নিছি। মোক ক্ষমা কইরে দেন আপনেরা সব। মোর কথা শুনেন সব। মুই সারবান লোহার, মোর বাপের নাম হীরামন। লোহার আপনাহরের দশজনের মতোই মুই একটা মানুষ। একটা হালুয়া চাষী।'' সেতু, জাফর, ঝড়ু, চৈতা, ব্রজেন, নগেন, গিদন প্রভৃতি চরিত্র সহজ সরল সংস্কার বিশ্বাসী। ছেলেপুলে, ঘর সংসার যেমন এদের জীবনের এক মাত্র ধন, তেমনি গ্রাম্য দেবতা গ্রাম্য দেবতার স্থান, দেবতার পূজারী, দেবাংশী এদের ধন।

গ্রামের সহজল সরল অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের রোগের চিকিৎসা, ভূত-প্রেতাদির ভয় থেকে রক্ষা, বিপদ থেকে উদ্ধার করে গ্রাম্য গুণমান সামসের ও বিরাম। হঠাৎ একটি ছেলে আপন মনে বিষহরির থানে ঢুকে পড়ে সেখানে মানুষের প্রবেশ ধর্মসিদ্ধ ও ধর্মসাধ্য নয়। সামসের এবং বিরাম সেই ছেলেটির দেবত্ব পরীক্ষা করতে শুরু করে সেই সময় ছেলেটির মনিব রঘুনাথ ছুটে আসে। সামসের এবং বিরামকে রঘুনাথ ছেলেটির স্বভাব সম্পর্কে বলে ''পরায় পরায়। কাম কইরতে কাম কইরতে তাকে থাকে আকাশ দিকে। উদাস। মুই হয়ত কনু— এই কি দেখছুরে? গাছত যে পাতা পড়ছে, তাই দ্যাখছি। দেখেন দিনি ক্যমকা শয়তান।'' তারপর বিরাম রঘুনাথের সম্মতি নিয়ে ছেলেটির উপর দৈব্যশক্তি আছে কিনা তার পরীক্ষা চালায় থানের চারপাশে দু মুঠো ধূলো নিয়ে তিন বার ঘুরে বন্দনা শুরু করে— ''একখানি পুষ্পরিণী চারিখানি ঘাট তাহাতে জমিল পদমের পাত নামেক বিষ তুই স্বর্গ পাতাল হেরি চারি উজান ধাইস দোয়ায় লাগে কামুখ্যায় মুণ্ডুখাস।'' ঢোল আরও জোরে বাজতে শুরু করে, বিরাম বিকট চিৎকার করে বলে— ''আয় আয় জিবলী আয় মহারাজ কংসের আজ্ঞায়।'' ছেলেটি অর্থাৎ সারবান কাঁপতে কাঁপতে উঠে উঠে দাতাতে চেষ্টা করে। কোনভাবে যে গণ্ডীর বাইরে আসতে পারে।

এরপর বিরাম বলে— 'খবরদার'-ই ছাওয়ালোক কেউ ছুবেন না। ই ছাওয়াল সামান্য মুনিষ্যি

নয়। ই ছাওয়াল দেবাংশী।" এইভাবে মানুষ সারবান দেবাংশী হয়ে ওঠে। বিরাম রঘুনাথের কাছ থেকে সারবানকে কিনে নেয় পঞ্চাশ টাকায়— ''নয় নয় বুজা পারছি, দেবতা নিয়ে যাচ্ছি আমার ঘর থথে। তুমি হচ্ছেন দ্যাবতার মালিক। পরনামী কিছু দিম। দেবতার দাম দেয়া যায় না। এই ন্যাও মোড়ল পঞ্চাশ ট্যাকা।" মানুষ কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে দেবাংশী তৈরি করে— ''দেবতা কি দশজনার তৈরি নিয়ম ভাঙবা পারে? মানুষ আছে তোবেই না দেবতা আছে। এই যে মোক দেবাংশী বানাছে— সিতো মানুষই।" আবার মানুষই নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে দেবাংশী ধ্বংস করে। গ্রামের মোড়লের কোপ থেকে ভাগচাষী সেতুকে উদ্ধার করতে গিয়ে সারবান মোড়লের আক্রোশের শিকার হয়। সারবানের স্ত্রী মোক্ষদা ভয় পায়— তুমি হলেন দেবাংশী, তুমি মানুষকে ভয় পান? তখন সারবান বলে— ''দেবতার কোপ মানুষের উপর পড়ে, মানুষ হারায়। ফির দেবতার কাছে আর্জি জানায়। দেবতা কিরপা করলে ভালো, নাতে মানুষের কেছুই করবার নাই। দেবতার সাথ বিবাদ কইরবার ক্ষ্যামতা মাইনষের নাই। কিন্তু মাইনষের কোপ যদি আর এটা মাইনষের উপর পড়ে, আর ঐ কোপ খাওয়া মানুষটা যদি দেবতার কাছে আর্জি জানায়, বিচার চায় তখন দেবাংশী কি কইরবে! কি করা কত্তব্য তার?" নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিনায়ক চরিত্র দেবেন মণ্ডল দেবাংশীকে বলে— ''শুন হে সারবান লোহার, তোমার এলা বোলচাল শুনার সময় আমার নাই। আর তোমার ঐ দেবাংশী ছোট্ মোর উপর না দেখান। দেবাংশী আছেন, দেবাংশী যাক, মুই কাক কেছুই কম না। কিন্তু পরের বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে বেশি মাথা ঝুকালে তোমার ঐ মাথা মুই নামাই দিম সি খিয়াল থাকে যেন— ''দৈব বশে দেবেন মণ্ডল সাপের কামড়ে মারা গেলে সারবানের সঙ্গে দেবেনের দুর্ব্যবহারের জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে বলে অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ গুলো বিশ্বাস করতে থাকে এবং দেবাংশীর বিশ্বাস আরো গাঢ় হয়। এরপর দেবেনের কলেজ পড়ুয়া ছেলে বিনোদ হয়ে ওঠে প্রতি নায়ক চরিত্র। নগেন সত্যিই বলছে— দেবেন মণ্ডলক চিচ্ করিচে দেবাংশী। উহিনী সরকারের মুখথ্থে অক্ত উঠাবে দেবাংশী"— ব্রজেনের সন্দেহ হয়—উহিনী সরকারক তো দেবাংশী চিট্ কইরবে। কিন্তুক মণ্ডলের ছোট ছাওয়ালেক ঢিট্ করবে কেয়?"

গ্রামের অতি সহজ সরল, সংস্কার বিশ্বাসী ঝড়ু, জাফর, চৈতা, নগেন, সেতু, ব্রজেন নিজেদের ঘর সংসার বউ ছেলে পুলে নিয়ে সদা ব্যস্ত। দারিদ্রের শতঘাত প্রতিঘাতেও এরা নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেয়। ঘর সংসার সামলানোর পাশাপাশি এরা গ্রাম্যদেবতা, দেবতার পূজারী, প্রচলিত বিশ্বাস প্রভৃতিতে বিশ্বাসী। নিজেদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য এরা দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানায় দেবাংশীর নিকট। দেবাংশীও এদের প্রার্থনা মেটানোর পূর্ণ চেষ্টা করে। দেবাংশী নিজেও মানুষ, সে লোহা সম্প্রদায়ের মানুষ, সহজ সরল ও অশিক্ষিত গরিব মানুষ। সে ছোটবেলা থেকেই এই হত দরিদ্র

চাষীদের সুখ দুঃখের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছে। অন্যের দুঃখে সে ব্যথিত হয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়। গ্রামের মানুষ এর এই প্রার্থনাকে ভগবানের আশীর্বাদ মনে করলেও সারবান মনে করে সে মানুষের সেবা করে চলেছে কারণ সে নিজে মানুষ।

গ্রামের হতভাগ্য চাষীদের সামান্য জমি টুকুই শেষ সম্বল। সেই সামান্য জমি টুকুতেও যেন গ্রামের দেওয়ানী, জোতদার, জমিদারদের লোভ। জাফর, রুহিনী সরকারের শিকার, সেতু, দেবেন মণ্ডলের শিকার আর সাধারণের বিশ্বাস প্রিয় দেবাংশী সেই সমাজের শোষক ও শাসক শ্রেণীর শিকার। গরিব মানুষের দুঃখে সে কাতর এবং তার দেবতার কাছে প্রার্থনা— 'মোক রেহাই দে মাও বিষহরি— মোক রেহাই দে।" বিনোদ শিক্ষিত ছেলে, সে কুসংস্কারের কোন ধার ধারেনা। তার মনে হয়েছে— ''বাপ মরিছে সাপের কামড়ে তাত মোর দুঃখ নাই। কিন্তুক মাইনষে কয় দেবেন মণ্ডল মরিছে দেবাংশীর অভিশাপে— ওর অভিশাপের তেজ কত সিটা আমাক দেখবাও হবে। ওক ঢিঢ্ করা না পারি তে আমার নামে কুত্তা পুষেন আপনারা।" সুধীর, রুহিণী, পঞ্চানন, যজ্ঞেশ্বর-এরা একত্রিত হয়েছে দেবাংশীর বিরুদ্ধে। এরা সকলে একত্রিত হলেও এদের মধ্যে যেন এক অজানা ভয় কাজ করছে। নিজেদের রাগ, কায়েমী স্বার্থ আর আফশোস নিয়েই তারা ষড়যন্ত্রে একত্রিত হয়েছে দেবাংশীর বিরুদ্ধে। সুধীর সবার সামনে বলেছিল— ''এটা কিছু করাই নাগে পঞ্চাদা, নাতে অব দাপটেই ই গাও হামাহরের ছাড়া নাইগবে।"

নাটকটি তার 'ক্লাইম্যাক্স' স্তরে উন্নীত হতে থাকে দশম দৃশ্য থেকে। এই দৃশ্যেই দেখা যায় সুশিক্ষিত বিনোদ সেন এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। গ্রামের সহজ সরল মানুষ সেতু বর্মনের সঙ্গে তার বিবাদ বাঁধে— 'সারবান লোহার তোমাক মোর বাপের হাত থিকা বাঁচাইদিল কিন্তু মোর হাতত যে বাঁচবা না। ঐ শালা লোহার ইবাক তোমাক ক্যামকা কইরে বাঁচায় সেটা মুই দেখম।" দেবাংশীর প্রতি সেতুর অগাধ ভালবাসা, ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল বলেই সেইও বিনোদের প্রতিবাদ করে গর্জে ওঠে— ''বিনোদবাবু, সারবান লোহার মানুষ নয় দেবাংশী; আমাহরের দেবতা, তার নামে আর একটা বাজে কথা কইলে তোমার মাথা মুই দু'ফাক কইরে দিম। যাও বাড়ি যাও। বাড়াও আমার বাড়ির থে।" একদিকে কায়েমী স্বার্থ— অপরদিকে নিজেদের বিশ্বাস ভক্তি ও দেবতার অপমান— এই দুই বিপরীত মেরুর সংঘাত চরমে ওঠে। পরবর্তী একাদশ দৃশ্যে সারবানের অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম হয়ে ওঠে। সে ফিরে পেতে চায়— ''হা মা বিষহরি! মোক ই দায় থেকে মুক্ত কর মা, দেবাংশীর থে মোর ফির সারবান লোহার কইরে দে মা— সারবান লোহার কইরেদে।"

দ্বাদশ দৃশ্যে প্রতিনায়ক চরিত্র বিনোদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবাংশীর সংঘাত চরমে ওঠে। বিনোদ প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে ওঠে— '' বলছি তোমার দেবতা সাজার দিন শেষ।" এতদিন গায়

ছিলাম না— যা খুশি তাই করিছ। সাধু সেজেছ, পূজা পাট নিয়া থাক। কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপারে তুমি নাক গলবার কে হে শালা? ... শালা ক্ষেতমজুর, চাষী, বর্গাদার সবাইকে তাতাছে দেবতার ভড়ং নিয়ে।" সকলের প্রিয় দেবাংশী যে অপমানিত হয়। সাধারণের ভক্তি, বিশ্বাস সব যেন ধূলায় গড়াগড়ি খায়। দেবাংশী যেন একেবারে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসে— ''কাঁদিস না, কাঁদিস না কোকিলের মাও। আইজ ত্রিশ বছর মুই শুনে আসিছি মুই দেবাংশী দেবতার অংশ। কিন্তুক কোকিলের মাও আইজ মোর ভুল ভাঙছে। কুন সাদ নাই, কুন ধন্দ নাই। আইজ আমি বুঝা পারছি মুই এটা মানুষ। মোর শক্তি নাই— মুই নিজেকেও বাঁচাবা পারিনা।" নগেন, বনমালী, ব্রজেন, ছিদাম প্রভৃতি সরল-সাধারণ মানুষ বিনোদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাদের এতদিনের বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মানসিক ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলেছে এই কায়েমী স্বার্থন্বেষী বিনোদ, বিনোদের হিংসার শিকার হয় সুশীলা। পঞ্চদশ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই সামাজিক বিচারের আশায় দেবাংশীর কাছে যায় সেতু বর্মন। কিন্তু দেবাংশী এইসব সামাজিক উৎপীড়ণ ও মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেতে চায়।

ষষ্ঠদশ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই সারবানের বাড়িতে গ্রামের সকল মানুষ জমায়েত হয়। সকলেই তাদের প্রিয় দেবাংশীকে সেই 'থানে' গিয়ে বসতে বললেও দেবাংশী উঠে দাঁড়ায়। সুশীলা দেবাংশীর উদ্দেশ্যে বলে— দেবাংশী, মুই বিচার চাছি।" সারবান জানিয়েছিল— সি যখন মোর বয়স দশ বছর, মোর গুরু, মালিক, অন্নদাতা বিরাম গুণমান মোক দেবতার অংশ ভাবিছিস। তারপর এই ত্রিশ বছর বইয়ে আপনেরা বেবাক মোক দেবাংশী বাইনে দিছেন। আপানাহরের আর্জি শুনেছি নিদান দিচি। আপনাহরের কোনটা ফলে নাই। যিলা ফলিছে— সিলা দৈবের হোরে ফলিছে। ইয়তি মোর কেরামতি নাই।" সারবান সুশীলাকে নির্দেশ দেয়— ''বেবাক মনিষ্যি এটে আছে। হামাহরের কাছে আজি জানা তুমার বাপ আছে, স্বামী আছে— ইয়াদের কাছে বিচারচাও।" এরপর বিনোদকে দেখে সুশীলার মনে যেন এক দানব শক্তির প্রবেশ ঘটে। সে চিৎকার করে বলে ওঠে— ''এই, এই মানুষটা দেবাংশী। এই রাক্ষসটা মোর ইজ্জত লুটিছে ...।" দেবাংশী আর এখন দেবতার অংশ নয়, সে এখন একজন সাধারণ মানুষ সারবান, সারবান সকলের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে— ''ই মানুষটা পাপী, মহাপাপী, ইথথানে যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, স্বামীরা আছেন আপন আপন বিটি বুন পরিবারের ইজ্জত বাঁচাবার দায় আপনাহরের। যান, পাপীকে সাজা দেন।"

এইভাবেই ধীরে ধীরে জনসাধারণ সুসংহত, দৃঢ় ও নির্ভীক শক্তি নিয়ে অত্যাচারী, পাশবিক সমাজ বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে জেগে ওঠে। গতানুগতিক সমাজের শোষক ও অত্যাচারীর প্রতীক বিনোদ পিছু হটতে বাধ্য হয়— নাটকটির যবনিকা পড়ে।

এই নাটক সম্বন্ধে আজকাল (২৩.৬.৮৫) লিখেছিলো— ''এ-বছর জাতীয় নাট্যমেলায় আমরা বিভিন্ন প্রদেশের যে নাটক দেখেছি তার প্রত্যেকটি দেশজ। প্রতিটি প্রদেশের লোকাচার, জীবন আলাদা চেহারা নিয়ে ফুটে উঠেছে (ব্যতিক্রম ওথেলো) গতবার বাংলা নাটকের মধ্যে ছিল 'হাজার চুরাশির মা'— সেটি সময়ের দলিল। এবারে 'দেবাংশী' সমস্ত নাটকে নদী, মাটি জঙ্গল নিয়ে উপস্থিত। ফলে আমরা এক প্রায় বিস্মৃত রসের স্বাদ পেলাম। জাতীয় নাট্যমেলায় প্রতি প্রদেশে নামী খেতাব যুক্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বালুরঘাটের ত্রিতীর্থকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নান্দীকারকে ধন্যবাদ। ... দেবাংশী মূল গল্পটির লেখক অভিজিৎ সেন। ...আমাদের এখানে সাধারণত বিদেশী গল্প বা নাটকের ভাষান্তর ও রূপান্তর করা হয়। মৌলিক উপন্যাস বা নাট্যরূপ ব্যবসায়িক মঞ্চের এক্তিয়ারে। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ একটি দেশজ গল্পের নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য। নাট্যরূপের মুন্সিয়ানা উদাহরণ হয়ে থাকবে। নাটকের জন্য নাট্যকার যেভাবে গ্রহণ বর্জন করেন— সেটা লক্ষ্য করার মত। হরিমাধব গ্রামীণ পটভূমি নিয়ে নাটক করেন কিন্তু সমাদর করার জন্য আচম্বিতে গান বা খামোখা বর্ণনা নৃত্য দিয়ে ভরাট করেন না, নাটকের স্বার্থই তাঁর কাছে সব চেয়ে বড়। বিরাট যার পটভূমি চরিত্র সংখ্যা অনেক কিন্তু সবটাই বাঁধা থাকে নাটকীয় সূত্রে যা আলগা করা খুবই শক্ত।''

'মন্ত্রশক্তি' নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে আলোচ্য নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন। এটি একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রকাশক বড়াল প্রকাশনী, ৩৬/৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। প্রকাশনার কাল প্রথম প্রকাশ ২১শে বইমেলা, ফাল্গুন ১৪০৫ (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)। নাটকটি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৩রা এপ্রিল ত্রিতীর্থ গোবিন্দঅঙ্গন কল্যাণ মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত নাট্যোৎসব উপলক্ষে গিরিশমঞ্চে অভিনীত হয়। এই নাটকে অঙ্ক বিভাজন নেই, তবে মোট ১০টি দৃশ্য বর্তমান।

নাটকটির মূল কাহিনীতে লক্ষ করা যায়— সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থায় বর্গাদার শ্রেণীর কৃষকদের যে বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা ছিল অবিস্মরণী ও অভূদপূর্ব। এইবীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মূল মন্ত্র ছিল—'নিজ খোলানে ধান তোলো', 'আধি নাই তো-ভাগা চাই', 'কজ্জা ধানের সুদ নাই'। ওই সংগ্রামকে কৃষকদের রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। জমিদারি-জোতদারি শোষণ ও ভূমি ব্যবস্থাকে সমস্ত দেশবাসীর সামনে আসমণির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সেদিনের ওই সংগ্রাম। আর ওই সংগ্রাম ছিল সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় সংগঠিত কৃষক সংগ্রাম। তে-ভাগার দাবি ওই জেলার খাঁপুর অঞ্চলে সংগঠিত হয়ে নিপীড়িত বর্গাদার কৃষকদের মনে যথেষ্ট গভীর রেখাপাত করেছিল— এটি এই

নাটকে মূল ভাববস্তু।

ভারতের কৃষক আন্দোলনের উপর গড়ে উঠেছে 'মন্ত্রশক্তি'র কাহিনী। তে-ভাগা আন্দোলনের নামে এক কৃষক বিদ্রোহ যায় দক্ষিণবঙ্গে শুরু হলেও বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গেও গড়ে উঠেছিল, তারই এক অজানা কাহিনী 'মন্ত্রশক্তি'। উত্তরবঙ্গের ক্ষাপুর অঞ্চলে এই আন্দোলন এক আশ্চর্য তীব্রতা পেয়েছিল। পুলিশ বাহিনীকেও পরাজিত হতে এসেছিল। শামসের নামে এক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে আন্দোলন অসামান্য বলিষ্ঠতা পেয়েছিল। শামসেরকে খুঁজে বের করতে নাজেহাল হতে হয়েছিল স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে। পরে জানা যায় শামসের বলে কেউ ছিল না। যশোদা বর্মন নামে এক সাধারণ রমণী সমগ্র আন্দোলনটিকে পরিচালনা করেছিলেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন সমাজের সকল স্তরের মানুষকে। তিনি নিঃশব্দে কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন। সুপরিকল্পনা করে পুলিশকে থানায় বন্দি করে বন্দুক লুঠ করে এনেছিলেন। মাঠভর্তি ফসল কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন— মন্ত্রশক্তি তারই কাহিনী।

এই নাটক সম্বন্ধে বর্তমান পত্রিকায় 'ত্রিতীর্থের মন্ত্রশক্তি: আমাদের ঐতিহ্যেরই মঞ্চ লিখন' শিরোনামে রথীন চক্রবর্তী লিখেছেন— ''ত্রিতীর্থ সম্প্রতি গিরিশ মঞ্চে উপস্থিত করলেন তাদের সাম্প্রতিকতম উদ্যোগ 'মন্ত্রশক্তি' প্রায় নিঃশব্দেই। ... আমরা আগেই দেখেছি পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় কোন নাটকেই আঞ্চলিক চরিত্র ও পরিবেশকে অহেতুক পালিশ। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। ফলে মঞ্চে উঠে এসেছে বিশ-ত্রিশ দশকের উত্তরবঙ্গ, পাওয়া গেছে তার আশ্চর্য মাটির গন্ধ। হরিমাধব ডিটেলিং ভালোবাসেন। তাই অনুভব করা গেছে এক গেরস্থানে এবং গ্রামীণ উষ্ণতা। হরিমাধব পছন্দ করেন স্বাভাবিকতা, পাওয়া গেছে তাই অভিনয়ের মধ্যে জীবনের শব্দ। গ্রুপথিয়েটারের নাটক মানে দলগত প্রযোজনা। আলাদাভাবে পাত্র পাদীদের উল্লেখ তাই অপ্রাসঙ্গিক। শুধু বলতে হয় যশোদা বর্মণের ভূমিকায় অনিমা ব্যানার্জী উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছেন। ... সে ইতিহাস আমাদের চালিত করে বৃহত্তর লড়াইয়ে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতেই হবে। এবং তাকে থিয়েটারের বারবার ফিরিয়ে আনতে হবে আগামী দিনের ইতিহাস রচনার জন্য। ত্রিতীর্থ সেই দায়িত্বই পালন করেছে।''

'অনিকেত ' এটি একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প অবলম্বনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এ নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন। প্রকাশক 'বহুরূপী' সংখ্যা-১, ৭ লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা-১৭, সম্পাদক কুমার রায়, প্রকাশকাল উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

দৃশ্যসংখ্যা ৪টি এবং নাটকটিতে কোনো অঙ্ক বিভাজন নেই। কেন্দ্রীয় চরিত্র মনোরমা, সহ প্রধান চরিত্র দেবুকাকা এবং অন্যান্য চিরত্রগুলি হল— রাণা, প্রিয়তোষ, রুচিরা, সুগত, অদিতি,

বানান, মুন্নি প্রভৃতি। নাটকটির কেন্দ্রীয়ভাব হল চিরায়ত সমাজ-স্বীকৃত পারিবারিক বন্ধন বর্তমান সমাজ তথা পরিবারের তর্ক্মা নিষিদ্ধ মানবিক স্নেহ প্রেম প্রীতির সম্পর্ককে কতটা মেনে নিতে পারে তা নিয়েই। এ নাটকে আধুনিক শিক্ষিত পরিবারের একটি সংকট প্রকটিত হয়ে উঠেছে। প্রিয়তোষ স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছিল মনোরমা ও দেবব্রতের সুগভীর বন্ধুত্ব। নাটকটি খুবই ছোট। মনোরমা ও প্রিয়তোষের সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর প্রিয়তোষের পিসতুতো ভাই দেবব্রত উপস্থিত হয়। দাদার বাড়িতে কিছুদিন থাকার কথা থাকলেও সে প্রায় ৩০টা বছর তাদের সঙ্গে কাটায়। দেবব্রত ও মনোরমার মধ্যে এক সুন্দর বন্ধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রিয়তোষ ও মনোরমার সংসারের সুখ দুঃখ প্রতিষ্ঠা সময়ই সে পাশে ছিল। তাদের সম্পর্কে কখনই ফাটল ধরেনি। ঘটনাচক্রে প্রিয়তোষ মারা যায়। স্ত্রী মনোরমার মধ্যে সামাজিক বাঁধা নিষেধবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বাড়ির কর্তা প্রিয়তোষ মারা যাওয়ার পর মনোরমা একদিন হঠাৎ প্রশ্ন তোলেন বাড়িতে আশ্রিত দেবু এবার কোথায় থাকবেন? মায়ের সংশয়টাকে প্রথমে কুসংস্কার মনে করে কেউ আমল না দিলেও ক্রমশ তাদের সকলের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। কেননা দেবুকাকার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে চাইছে না, আবার চাইছেন দেবুকাকা যেন কাছাকাছি থাকে। তাই মায়ের এই মনোভাব থেকে ছেলেমেয়ে তথা সকলের মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে কী এই দুজনের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে, যা এখন বাইরের মানুষের কাছে নিন্দনীয় হয়ে উঠতে পারে? আবার তাদের মনে এই প্রশ্নও জাগে যে, বিধবা হওয়ার পর হয়তো লোকলজ্জার ভয়ে মা মনোরমা আর তা চাইছেন না? মনোরমা আর দেবব্রতের হৃদয়ের বিচ্ছেদ ঘটে— ''একদিন না একদিন এ নিয়ে কথা উঠতোই। তোদের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মারতো। এ এবং ভালই হল, সব কিছু উল্টা হয়ে গেল। তোরা স্বস্তি পেলি। আসলে কি জানিস তোর বাবা একটু বেশি progressive ছিল। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা শুধু বন্ধু হয়ে একত্র বাস করতে পারে এটা একটু আগাম ভাবনা। তোর বাবা এটা বুঝতে পারেনি— আমিও না। আমরা ভেবেছিলাম ভাবনাটা আমরণ লোকের মাথায় ঢুকিয়ে দেব। এমনিতে না হয়, গজাল মেরে ঢুকিয়ে দেব। কিন্তু পারলাম না — "Well, we accept the defeat most sportingly." আমাদের বন্ধুত্ব নিখাদ, পবিত্র। আজ তোদের বাবার মৃত্যুর পর সেই বন্ধুত্বের প্রতিকেউ কোন কটাক্ষ করবে সে আমি সহ্য করতে পারবনা।" দেবব্রত সারা জীবনের মতো অজানার দেশে পাড়ি দেয়। মোটকথা, আধুনিক শিক্ষিত শহুরে ছেলেমেয়েদের মনুষ্যত্ববোধের বাস্তব চিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

'খারিজ' নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রকাশিত হয় নাট্যচিন্তা, নাট্যতীর্থ-নাটক সংস্কৃতি সংবাদ ত্রৈমাসিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায়। প্রকাশনার কাল ১৪০৩।

নাটকটিতে মোট ৯টি দৃশ্য রয়েছে। নাটকটিতে অঙ্ক সংখ্যা না থাকলেও দৃশ্য-বিভাজন সমন্বিত নাটক। নাটকটিতে মোট চরিত্র সংখ্যা ১৬টি। কেন্দ্রীয় চরিত্র বনমালী। প্রতিনায়ক চরিত্র নগেন। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি হল— নালু, বনমালী, বিনোদ মাস্টার, ঘনশ্যাম, মকবুল, সুবল, ডাকাত সর্দার, ১ম ডাকাত, ২য় ডাকাত, সুধীর, মাধাই, তুলসী ভামনী প্রভৃতি।

গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুদখোর বনমালী হতদরিদ্র কৃষকদের ঋণের জালে জর্জরিত করে তাদের স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তিই দখল করে নেয়। অর্থাৎ কৃষকদের চিরতরে বেঁধে ফেলে শোষণ করতে থাকে। গল্পের প্রতিনাথ নগেন হল তার ভাগচাষী। বনমালী তার কাছে গচ্ছিত সমস্ত ধন সম্পদ আত্মসাৎ ও দখল করার জন্য নকল ডাকাত সাজিয়ে তার বাড়িতে নকল ডাকাতি করায়। নগেন তখন গরিব মানুষের সোনাদানা, ঘটিবাটি, জমি, এমনকি শরীর বন্ধক রাখার হিসাবের খাতাটি সে নিয়ে নেয়। এবং নিজেকে গ্রামের মানুষদের অর্থ পিশাচ সুদখোর মহাজন বনমালীর তৈরী করা ঋণজাল থেকে খারিজ করে নেয়। তাই সে দৃঢ় কণ্ঠে গ্রামের অসহায় গরীব চাষীদের উদ্দেশ্যে বলে— শুধু মোর নয় মণ্ডল। আইজ রাতে আমি ব্যাবাক গরীব মানুষ গুলানক খারিজ দেমো।" মোটকথা নগেন খবু সুকৌশলে বনমালীকে উচিত শিক্ষা দিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। কারণ গ্রামবাংলার অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত চাষী, কৃষক মজুর শ্রেণীর মানুষদের এইসব মহাজন শ্রেণীর মানুষের দিনেরপর দিন শোষণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিঃস্ব করে আর্থিক-সামাজিক শোচনীয় পরিস্থিতি তৈরী কবে। নাই নগেন অন্তর থেকে সুদখোর মহাজন বনবালীর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

যদি এমন হতো- হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ে লেখা সামাজিক একাঙ্ক নাটক। প্রকাশনায় অপকট পত্রিকা' শারদ, ২০০২, দ্বাদশ বর্ষ, সম্পাদক-পার্থসারথি মৈত্র প্রকাশ কাল-১২ই অক্টোবর, ২০০২ খ্রি. নাটকটি ত্রিতীথের প্রযোজনায়, গোবিন্দ অঙ্গনে মঞ্চে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান আরোপিত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুমনের সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের চেয়ে একটি বিকৃত চিন্তা চেতনা, সক্রিয় হয়ে উঠে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই নাটকটির মূল উপজীব্য। আমাদের সমাজে শিশুশ্রমকে পুঁজি করে তাদেরকে মজুর খাটানো হয় কিন্তু একটি নাবালক শিশুর মনেও পড়াশুনার প্রতি আগ্রাহ জন্মাতে পারে— যদি সে তার চিন্তাধারা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ পায়। আজকের শিক্ষা পদ্ধতিতে কোন বিষয় সব সময় উপর থেকে আরোপিত বা চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা দেয়া। স্বভাবতই শিশুর মন তাতে বিদ্রোহ করে। সে চায় খোলা আকাশ, গাছের ছায়া, নদী ও খেলাধূলা ফলে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী থেকে যে শিক্ষাপদ্ধতি, যেখান থেকে সে বেরিয়ে যেতে চায়। এর ফলে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ে কিন্তু

মানবিকভাবে তাদের সেই পছন্দের বিষয়গুলি নিয়ে যদি প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়। তাহলে তারা যেকোন বিষয়ে অতিসত্বর আগ্রহান্বিতে হয়ে উঠতে পারে— নাট্যকারের এই বক্তব্যই 'যদি এমন হত' নাটকে কতকগুলো দৃশ্য কোরাস এর মধ্যদিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে।

'পত্রশুদ্ধি' হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের লেখা মৌলিক সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকটি ত্রিতীর্থের গোবিন্দ অঙ্গন কল্যাণ মঞ্চে ২৬ শে আগস্ট ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। আলোচ্য নাটকটির কোন অঙ্ক বিভাজন নেই। ১১টি দৃশ্যে নাটকটি পরিসমাপ্তি হয়েছে। প্রতিটি দৃশ্য পারস্পরিক কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ।

নাটকটির মূল কাহিনী বস্তু হল রেশনের দোকানের কর্মচারী বলাইয়ের কাছে প্রতি শুক্রবারে একটি করে চিঠি আসে। চিঠি এলেই বলাই সাইকেলটি নিয়ে বেড়িয়ে যায় এবং ফিরতে অনেক দেরী করে। স্ত্রী কানন বলাইকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে এগুলি উকিলের চিঠি। কানন নিজে লেখাপড়া একেবারেই জানে না। চিঠিগুলি সে যত্ন করে রাখে। আসলে বলাই তার গোপন প্রেমিকা সরলার সঙ্গে দেখা করতে যায়। সে মেয়েটি কিছুটা লেখা পড়া জানে। কাননের মনের কখনো এই বিষয়ে কোন প্রশ্নই জাগেনি। একদিন গ্রামের সাক্ষরতা মিশনের দিদিমণি মধুমিতার কাছে কানন চিঠির কথা বলে। এবং কটি চিঠি দিদিমণিকে পড়তে দেয়। দিদিমণি সেই চিঠি পড়ে কাননকে সত্যি কথা বলে, যে এগুলো আসলে প্রেমপত্র। কাননের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে বলাই এর মতো বহু মানুষ পরিবারকে ঠকাই দিদিমণি এটা বুঝতে পারে। এবং ভেঙ্গে পড়া কাননকে গোপনে দিদিমণি লেখা পড়া শেখাতে থাকেন। কাননও খুব তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখতে থাকে। যা বিবাহের আগে সে সুযোগ পায়নি। একদিন কানন বলাইয়ের হাতে একটি চিঠি দেয়। বলাই অভ্যাসমতো সেই চিঠি খোলে এবং বিস্মিত হয়ে ওঠে। কারণ চিঠিটি কোন এক অজ্ঞাত যুবক তার স্ত্রী কাননকেই উদ্দেশ্য করে ইতি তোমার প্রেমমুগ্ধ 'ম'-এরূপ ছদ্ম নামে প্রেমপত্র দিয়েছে। বলাই সারা গ্রামে যত 'ম' দিয়ে নাম আছে তাদের সবাইকে সন্দেহের তালিকায় ফেলে এবং বলাইয়ের মধ্যে মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সে ঘাবড়ে গিয়ে গ্রামজুড়ে প্রেমমুগ্ধ 'ম' দিয়ে মনা, মদনা, মানিক নামে সকল যুবককে খুঁজে বেড়াতে শুরু করে। একদিন গোপনে গ্রামের তাপাপুকুরে ঝোপের আড়ালে বলাই লুকিয়ে থেকে মদনার গতিবিধি লক্ষ রাখছিল। ঠিক সেই সময় গ্রামের যাত্রাদলের ছেলেরা তাকে দুষ্কৃতি ভেবে বলাইকে বেধরক মারে। এবং বলাই বাড়িতে এসে বলে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে যে চোট পেয়েছে। কানন হাসে এবং দিদিমণি মধুমিতা সব খোলসা করে দেয়। এবং বলাই নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং কাননকে পড়াশুনায় উৎসাহিত করে। এবং নিজেও উৎসাহীত হয়।

'গণেশ গাঁথা' নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকের

শ্রেণীবিন্যাসে এটি একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। কালিয়াগঞ্জের বিচিত্রা নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে কালিয়াগঞ্জের নজমু নাট্যনিকেতনে স্বয়ং নাট্যকারের পরিচালনা ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে।

এই নাটকে গণেশ সাড়া গ্রাম জুড়ে 'অযাত্তা', 'কুসাইত', 'অপয়া' বলে পরিচিত। তাই গ্রামের সবাই তাকে 'দূর ছেই' করে। তার মুখ দেখলে সমস্ত কাজ পণ্ড হয় দুর্ঘটনা দেখা দেয় এমন বিশ্বাস সকলের মনে দৃঢ় বদ্ধ। এইরূপ কুসংস্কারের শিকার যুবক গণেশ। তাই গণেশ সমাজের সকলের কাছ থেকে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হয়ে মোটের উপর নিঃসঙ্গ, দুর্বিসহ ও একাকিত্বে জীবন কাটায়। গ্রামের বাড়িতে কেউ তাকে কোন কাজ দেয় না। এই জন্য সে কর্মহীন অবস্থায় শুধু একমাত্র সম্বল পিসির আশ্রয় থেকে নানা রকম অপমান অমর্যাদা সহ্য করে অতিকষ্টে দিন গুজরান করে। এর ফলে বাধ্য হয়ে একটি মুখোশ ব্যবহার করে সেটা গণেশের। হঠাৎ এক পৈতৃক পুকুরের স্বত্ত্ব নিয়ে গ্রামের দুই বিত্তবান ভাই ধানী পোদ্দার ও মনা পোদ্দারের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা বাঁধে। ফলে দুই ভাইয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। এবং গণেশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তখন গণেশ ছোটভাই মনার কথামতো টাকার বিনিময়ে রাজী হয় এই শর্তে যে, যেদিন মামলা মোকদ্দমার তারিখ সেদিন সকালে গিয়ে তার কুসাইত মুখ বড় ভাই ধানী পোদ্দারকে দেখাতে হবে। এই শর্তমাফিক সে সকালবেলায় ধানী পোদ্দারের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। বড় ভাই ধানী পোদ্দার সকাল বেলায় গণেশের মুখ দেখে চোখ বুঝে থাকে। এবং রুষ্ট হয়ে তাকে তাড়াতে চায়। কিন্তু গণেশ বাড়ি থেকে কিছুতেই যেতে চায় না। এ অবস্থায় ধানী পোদ্দার গণেশের কাছ থেকে জানতে পারে যে, ভাই মনা উক্ত মামলার ব্যাপারে গণেশকে কাজে লাগিয়েছে। তখন ধানী পোদ্দার গণেশকে ভাইয়ের চেয়ে দ্বিগুণ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তার কুসাইত মুখ মামলার দিনে ছোটভাইকে দেখানোর প্রস্তাব দেয়। গণেশ এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুইভাইয়ে কাছ থেকে টাকা আদায় করতে থাকে। গ্রামীণ লোকবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত কুসংস্কারের প্রবল আঘাতে মর্মাহত গণেশ ঘটনাক্রমে বঙ্গলক্ষ্মী সুপার বাম্পার লটারি খেলায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভে সৌভাগ্যবান প্রতিপন্ন হয়ে ওঠে। গ্রামের মানুষের ভুল ভাঙে এবং গণেশের দুর্নাম ঘুচে যায়। এমনকি গ্রামীণ সমাজের কাছ থেকে গণেশের উপর আরোপিত কুসংস্কারের খোলস বিদায় নেয়। এইখানেই কাহিনী সমাপ্ত হয়।

এই নাট্যকারের অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হল—

১. বীজমন্ত্র (পূর্ণাঙ্গ)

২. মাতৃতান্ত্রিক (পূর্ণাঙ্গ)

৩. অসমাপিকা (পূর্ণাঙ্গ)

৪. বিছন (হিন্দি, পূর্ণাঙ্গ)

৫. পীরনামা (পূর্ণাঙ্গ)

৬. পনন (পূর্ণাঙ্গ)

৭. অনিকেত (পূর্ণাঙ্গ)

৮. বিপুলৌষধি (পূর্ণাঙ্গ)

৯. অন্তর্ধান (পূর্ণাঙ্গ)

১০. করকূহক (পূর্ণাঙ্গ)

১১. লুকোচুরি (পূর্ণাঙ্গ)

১২. চিরকুমার সভা (পূর্ণাঙ্গ)

১৩. জল (নাট্যরূপ মহাশ্বেতা দেবীর 'জল' গল্প অবলম্বনে)

১৪. অর্দ্ধচন্দ্র (পূর্ণাঙ্গ)

১৫. খারিজ (পূর্ণাঙ্গ)

১৬. আহোত্রী (পূর্ণাঙ্গ)

১৭. অগ্নিশুদ্ধি (পূর্ণাঙ্গ)

১৮. ক্ষীরের পুতুল (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে রচিত)

১৯. অচিন সখা (শ্রুতিনাটক)

২০. অঙ্গনা গাঁধা (নৃত্যনাটক)

২১. পঁচিশ পঁচাত্তর (বেতার নাটক)

'যদি এমন হতো' হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের লেখা সামাজিক একাঙ্ক নাটক। প্রকাশনায় অকপট পত্রিকা, শারদ ২০০২, দ্বাদশ বর্ষ, সম্পাদক পার্থসারথি মৈত্র, প্রকাশকাল ১২ই অক্টোবর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ। নাটকটি ত্রিতীর্থের গোবিন্দ অঙ্গন মঞ্চে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে আগস্ট অভিনীত হয়।

বর্তমান আরোপিত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুমনের সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের চেয়ে যে বরং একটি বিকৃত চিন্তা চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই নাটটি মূল উপজীব্য।

আমাদের সমাজের শিশুশ্রমকে পুঁজি করে তাদেরকে মজুর খাটানো হয়। কিন্তু একটি নাবালক শিশুর মনেও পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ জন্মাতে পারে যদি সে তাঁর চিন্তাধারা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ পায়। আজকের শিক্ষা পদ্ধতিতে কোন বিষয় সবসময় উপর থেকে আরোপিত বা চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা দেখা দেওয়ায় স্বভাবতই শিশুর মন তাতে বিদ্রোহ করে। সে চায় খোলা

আকাশ, গাছের ছায়া, নদী ও খেলাধূলো। ফলে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি থেকে যে শিক্ষাপদ্ধতি সেখান থেকে সে বেড়িয়ে যেতে চায়। এরফলে স্কুল ছুটের সংখ্যা বাড়ে কিন্তু মানবিকভাবে তাদের সেই পছন্দের বিষয়গুলি নিয়ে যদি প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারা যে কোন বিষয়ে অতিসত্তর আগ্রাহান্বিত হয়ে উঠতে পারে— নাট্যকারের এই বক্তব্যই যদি এমন হত নাটকে কতগুলি দৃশ্য কোরাস এর মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে।

এই নাট্যকারের অন্যান্য একাঙ্ক নাটকগুলি হল—

১. ভোজন দক্ষিণা (একাঙ্ক)

২. অকথিত মহাভারত কথা (একাঙ্ক)

৩. বন্দুক (একাঙ্ক)

৪. বোধদয় (একাঙ্ক, শিশুনাটক)

৫. ঠাকুরদা (একাঙ্ক, রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা গল্প অবলম্বনে রচিত)

৬. নিকট গঙ্গা (একাঙ্ক)

৭. গোধূলী বেলায় (একাঙ্ক)

৮. অন্যমনস্ক চোর (একাঙ্ক)

৯. উপলব্ধী (একাঙ্ক)

১০. উত্তরণ (একাঙ্ক, শিশুনাটক)

'প্রজন্মের কাল' এটি ৮টি কাব্যনাট্যের একটি সংকলন গ্রন্থ। অজিতেশ ভট্টাচার্যের লেখা। প্রকাশক 'পুনশ্চ' ৯ এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-০৯, প্রকাশকাল- সেপ্টেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। সঙ্কলন গ্রন্থে প্রজন্মের কাল, লখিন্দর যুদ্ধে যায়, রাজা একদিন দ্বিতীয় কাঠ, জাগরণে শয্যা, সমর্পণে যদি, স্বগত সংলাপ, সূর্যের প্রতিমুখ— এঈ আটটি কাব্যনাট্য রয়েছে।

'প্রজন্মেরকাল'-কাব্যনাট্যটিতে তিনটি চরিত্র রয়েছে— যুবতী, বৃদ্ধ, চিকিৎসক। কাব্যনাট্যটিতে তিনটি চরিত্রই পারস্পরিক মেলবন্ধনে সক্ষম হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় কাব্যনাট্যটি হল— ''লখিন্দর যুদ্ধে যায়, এখানে মোট পাঁচটি চরিত্র রয়েছে— নাট্যকার, পরিচালক, বেহুলা, সনকা, লখিন্দর। কাব্যনাট্যটিতে কোরাসের ব্যবহার সুন্দরভাবে করা হয়েছে। 'রাজা একদিন' তৃতীয় কাব্যনাট্য। এই কাব্যনাট্যটি পাঁচটি চরিত্রে সংগঠিত— কমলা, কোতায়াল, গৃহপতি, দ্বিতীয় কণ্ঠ, রাজা, প্রতিটি চরিত্রই এখানে স্বতন্ত্র। চতুর্থ কাব্যনাট্যটি হল— দ্বিতীয় কণ্ঠ। এখানে চারটি চরিত্র হল পয়োষ্ণী, বসুধা, অরিজিৎ, সমর্পণ। চরিত্রগুলির বক্তব্য সামলীল হলেও নাট্যবন্ধনে শিথিল। 'জাগরণের শয্যা'—পঞ্চম নাট্যকাব্য 'এই নাট্যকাব্যের চরিত্রগুলি হল— অরুনেশ, সুদীপা, পত্রলেখা,

বিনয়, চারু প্রভৃতি। এখানে নাট্যসংহতির সুন্দর সমন্বয় দেখানো হয়েছে। 'সমর্পণে যদি' ষষ্ঠ সংখ্যক কাব্যনাট্য। অলোকেন্দু, দীপান্বিতা, অরিত্র, শশি এই চারটি চরিত্র এখানে রয়েছে। এখানে কাব্যগুণ না থাকলেও নাট্যগুণ রয়েছে— ''স্বজত সংলাপ' হল সাত সংখ্যক কাব্যনাট্য। এটি একটি একক অভিনয়যোগ্য কাব্যনাট্য। 'সূর্যের প্রতিমুখ' হল শেষ সংখ্যক কাব্যনাট্য। এই কাব্যনাট্যের চরিত্রগুলি হল— শোভন, বৈশাসী, দীপাধার প্রভৃতি। এই কাব্যনাট্যটি নাট্য অঙ্গনে কাব্যরস স্বাভাবিক।

'সানাই' প্রদোষ মিত্রের কাহিনীর সূত্র ধরে নাট্যকার ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি সার্থক সামাজিক একাঙ্ক নাটক প্রকাশনায় নাট্যচিন্তা নাট্যতির্থ, নাটক সংস্কৃতি সংবাদ ত্রৈমাসিক, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সম্পাদক প্রণব চক্রবর্তী, প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৯৮ খ্রি:। এই একক অভিনয় সমৃদ্ধ নাটকটি প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় কলকাতায় 'চেনা-অচেনার' আমন্ত্রণে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ৫ই মে একাডেমীতে মঞ্চস্থ হয়। এবং যথার্থ মঞ্চসাফল্য লাভ করে। এরপর কলকাতার নান্দীকারে জাতীয় নাট্যোৎসবে ও কল্যাণীতে ও জাতীয় নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতি হয়। কলকাতার নাট্যএকাডেমীর শিশুনাট্যমেলায় আমন্ত্রিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এবং মুম্বাইতে তিনবার মঞ্চস্থ হয়।

'সানাই' এই নাটকের কাহিনীর পরিকাঠামো আমাদের সকলের বেশ পরিচিত এবং জানা। কর্মরত পিতা মাতার একমাত্র কন্যা সন্তান সানাই প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে ডুপ্লিকেট চাবি খুলে নিঃসীম শূন্যতায় ওরা ফ্ল্যাটের খাঁচায় প্রবেশ করে। সঙ্গী তার কয়েকটি পুতুল, একটি শিশুর দোলচেয়ার, স্কুল ব্যাগ, বইখাতা আর একটি টেলিফোন, এমনকি এই শিশুদের কোন শৈশব নেই। খেলার জন্য উঠোনে-আঙ্গিনা নেই। নানারকম আব্দার ও বায়না সহ্য করার ঠাকুমা-পিসিমা নেই। প্রতিদিন স্কুল থেকে সে যখন ফ্ল্যাটে ফিরে আসে তখন তার সময় কিছুতেই কাটে না। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে একায় বন্দী হয়ে নেচে গেয়ে এক্কা দোক্কা খেলে অথবা কখনো টিভি দেখে আবার বিরক্ত হয়ে টিভি বন্ধ করে দেয় কিংবা তার একমাত্র নির্বাক সঙ্গী পুতুলদের সঙ্গে বাড়ির পাকাবুড়িদের মতো বক বক করতে থাকে সেই সঙ্গে সে তার স্কুলের কোনো বন্ধু কাকুর সঙ্গে এয়ারপোর্টে 'ঘুরতে গেছে শুনলে তাকে রীতিমতো হিংসে করে। সানাইয়ের একটা গল্পবলা ঠাকুমা ছিল কিন্তু তিনিও এই পরিবারের অন্যান্য অবাঞ্ছিতের মতো নির্ধারিত হয়ে অন্যত্র কোথাও অসহায় ও নিঃসঙ্গতায় জীবন অতিবাহিত করছেন। মা তাকে সবসময় যেভাবে প্রতি পদক্ষেপে শাসন করেন ঠিক সেই রূপ আচরণ সে তার খেলার নিত্যসঙ্গী নির্বাক পুতুলদের সঙ্গেও করে থাকে। এমনকি সানাই তার সময় কাটে না জন্য বাধ্য হয়ে সে টেলিফোনে ডেকে ডেকে গল্প শুনতে চায়। তাই মাঝে মাঝে যখন ফোন বাজে, এক আধটা কোন খবর আসে, আবার রং নাম্বার হয় আর তখন সে

পরিচয় অপরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ডেকে ডেকে সকলের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়ে মনের ভাব বিনিময় করতে চায়। বিশেষ করে বড়দের কাছ থেকে সবদিক থেকে প্রত্যাখাত হয়ে যখন টেলিফোন নীরব থাকে তখন সে গল্প বানাতে থাকে, বই খাতাগুলো পুতুলদের সামনে পেতে দেয় আবার পড়াশুনা নিয়ে পিতা-মাতার কিছু কিছু কথা অনায়াসে নকল করে এবং পুতুলকে দোলচয়ারে বসিয়ে পক্ষিরাজ ঘোড়া চড়ায়। প্লেনের আওয়াজ শুনলে এবং মেয়ের গর্জনেও সানাই এক জানলা থেকে আর এক জানলার অভিমুখে ছুটে যায়। মুক্তির প্রতীক সানাই-এর আকাশ খোঁজার সহজাত সংস্কারের মানসিক উন্মাদনার মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে।

'জলপোকা' নাট্যকার জিষ্ণু নিয়োগীর লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাট্যশ্রেণীগত বিভাজন সাপেক্ষে একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয়নি তূণীর নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় এবং মোহর চক্রবর্তীর নির্দেশনায় বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চে অভিনীত হয়।

জলপোকা নাটকটিতে আটটি দৃশ্য, চরিত্র সংখ্যা মোট ১৪ টি। মুরারী, হারান, বিশু, কৌশল্যা, যতুন, গোবিন্দ, বিধান, অনাথ, অমল, নৃপেন, মর্মর মলিনা, দীপা, শ্যামলী।

'জলপোকা' নাটকটি প্রধান বিষয়বস্তু দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রধান নদী আত্রেয়ী নদীকে ঘিরে। প্রথম দৃশেই দেখা পাবনা জেলার জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা অভিবাসী হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের খিতিরপুর অঞ্চলে আত্রেয়ী নদীর তীরে হালদার পাড়ায় বসবাস করতে আরম্ভ করে। এই ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষেরা আত্রেয়ী নদীতে নৌক্যো ও জাল নিয়ে মাছ সংগ্রহ করে জীবিকা যাপন করে। নাটকে দেখানো হয়েছে আত্রেয়ীকে ঘিরে মুরারীর (নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র) স্বনির্ভরতা। মুরারী চিন্তিত কারণ দূষণের ফলে নদীতে মাছ হারিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে আত্রেয়ীর ঐতিহ্য, গর্ব 'রাইখর' মাছ। জলসংকটের ভয়াবহতার কথাও উচ্চারিত হয়েছে। মুরারীর ছেলে বিশু কাজকর্ম তেমন করে না, খারাব চরিত্রের। MLA অনাথ ঘোষ ভোটের আগে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে কথা রাখেনি। ফলে সমাজ-জীবন রাজনীতির জীবন সংকটও প্রতিফলিত হয়েছে নাটকটিতে। নাটকের শেষে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে চরম হতাশা, দারিদ্রতা, অবসাদ লক্ষ করা যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে মারা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী - 'নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবনী ও নাট্যসাধনা', পুনশ্চ, কলকাতা-৯, ১ম সংস্করণ ২০ জানুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ. ৭৪

২. প্রাগুক্ত, - পৃ. ৭৪

৩. ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী - ‘বাংলা নাটকের বিবর্তনের বালুরঘাট নাট্যমন্দির ও নাট্যকার ড. মন্মথ রায়, শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির (১৯০৯-২০০৮) স্মরণিকা, সম্পাদক-অজিত মহন্ত, প্রকাশ-২২/০৪/২০১৩, পৃ. ২

৪. মেহরাব আলী, - দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের এক শতাব্দী, দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প-২০০২, ক্ষেত্রীপাড়া, দিনাজপুর সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৩৭

৫. ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী - ‘নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবনী ও নাট্যসাধনা’, পুনশ্চ, কলকাতা-৯, ১ম সংস্করণ ২০ জানুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮, ৭৯

৬. সনাতন গোস্বামী (সম্পাদিত) - ‘মন্মথ রায় নাট্যসমগ্র, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ১৫

৭. প্রাগুক্ত, - পৃ. ১৫

৮. মেহরাব আলী - দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের এক শতাব্দী, দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প-২০০২, ক্ষেত্রীপাড়া, দিনাজপুর সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৩৮

৯. ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী - ‘বাংলা নাটকের বিবর্তনের বালুরঘাট নাট্যমন্দির ও নাট্যকার ড. মন্মথ রায়, শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির (১৯০৯-২০০৮) স্মরণিকা, সম্পাদক-অজিত মহন্ত, প্রকাশ-২২/০৪/২০১৩, পৃ. ৩